যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রসমূহে প্রতিফলিত
প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি: একটি সমীক্ষা

পিএইচ. ডি. (কলা) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক: পিংকি খাতুন

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধনক্রম: A00SA0400419

বর্ষ: ২০১৯ - ২০২০

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা - ৭০০০৩২

তত্ত্বাবধায়ক:

অধ্যাপক অশোককুমার মাহাত

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৪

Yajurvedīya Dharmasūtrasamūhe Pratiphalita Prācīn(a) Bhārater Samāj(a) O Saṁskr̥ti: Ekṭi Samīkṣā

A thesis submitted to the Faculty of Arts, Jadavpur University in partial fulfillment for the Award of the Degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY

in

SANSKRIT

By

Pinki Khatun

Registration No: A00SA0400419

Session: 2019-2020

Under the Supervision of

Prof. Ashok Kumar Mahata

Department of Sanskrit, Jadavpur University

Department of Sanskrit

Jadavpur University

2024

CERTIFIED THAT THE THESIS ENTITLED

যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রসমূহে প্রতিফলিত প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি: একটি সমীক্ষা (YajurvedīyaDharmasūtrasamūhe PratiphalitaPrācīn(a) BhāraterSamāj(a) O Saṁskr̥ti: EkṭiSamīkṣā) Submitted by me for the Award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Prof. Ashok kr. Mahata, Dept. of Sanskrit, Jadavpur University.

And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/ elsewhere.

Countersigned by the Supervisor
Dated:

Candidate
Dated:

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সম্পূর্ণ কাজটি করতে গিয়ে আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় এবং কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, দি এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগীয় গ্রন্থাগার এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ বৈদিক স্টাডিজ-এর গ্রন্থাগার, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচার কর্তৃক উপকৃত হয়েছি। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই আমার তত্ত্বাবধায়ক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ড. অশোককুমার মাহাতকে এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ড. তারকনাথ অধিকারী মহাশয়কে, সমগ্র গবেষণা পর্বে যাঁদের আশ্রয় এবং সহযোগিতা না পেলে এই কাজটি সম্পূর্ণ হত না। কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ড. তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপক ড. দেবদাস মণ্ডলকে। সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. লোকনাথ চক্রবর্তী মহাশয়কে আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। সামগ্রিক কাজটিতে নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন করিমপুর পান্নাদেবী কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মহম্মদ লতিফ হোসেন এবং গবেষক প্রদীপ রায়। তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বিভাগীয় গবেষক বিমান অধিকারী, সৈকত বেরা, মহাদেব দাস, হাবল রুইদাস, মৌসুমি সাঁপুই সহ বন্ধু গবেষক অরিন্দম রায়কে ও আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের গ্রন্থাগারিক শ্রুতি মল্লিক এবং নিমাই সর্দার যেভাবে তাঁদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি ও আমি কৃতজ্ঞ। আমি প্রণাম জানাব আমার বাবা আকবর আলী এবং মা হাসিনা বিবিকে। নানাভাবে পাশে পেয়েছি ভাই পাপ্পু আলীকে। এসব কিছুর মিশেলেই আমার প্রয়াস – 'যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্র সমূহে প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি: একটি সমীক্ষা'।

সূচীপত্র

বিষয়:	**পৃষ্ঠাঙ্ক**
পদসংকেত:	
প্রথম অধ্যায় – ভূমিকা:	**১ - ১৪**
১.১ অবতরণিকা	১
১.২ বিষয়বস্তু	২
১.৩ সাহিত্য-পর্যালোচনা	৬
১.৪ গবেষণাবকাশ	১০
১.৫ গুরুত্ব	১১
১.৬ পূর্বানুমান	১২
১.৭ গবেষণাপদ্ধতি	১৩
১.৮ অধ্যায়-বিভাজন	১৪
দ্বিতীয় অধ্যায়- বেদাঙ্গ সাহিত্যে ধর্মসূত্রের গুরুত্ব:	**১৫ - ৩৪**
২.১ বেদাঙ্গ-সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা	১৫
২.২ ধর্মসূত্রসমূহের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ	২০
২.৩ যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রের বিশেষত্ব	২৮
তৃতীয় অধ্যায় – যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রে রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার চিত্র:	**৩৫ - ৭৪**
৩.১.১ ভৌগোলিক পরিবেশ	৩৫
৩.১.২ গৃহসংস্থান- আবাস	৩৬

৩.১.৩ রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাজতন্ত্র ৩৭

৩.২ সমাজ ৪৭

৩.২.১ বর্ণব্যবস্থা ও জাতিপ্রথা -ব্রাহ্মণ–ক্ষত্রিয় (রাজা)–বৈশ্য (বণিক)–শূদ্র (শ্রমিকশ্রেণী) - নিষাদ। ৪৭

৩.২.২ বর্ণসঙ্কর তত্ত্ব ৫৪

৩.২.৩ ব্রাত্য ও দাস ৫৫

৩.২.৪ বিবিধ জীবিকা ৫৬

৩.২.৫ চতুরাশ্রম ৬০

৩.২.৬ দায়ভাগ ৬৮

৩.২.৭ উত্তরাধিকার ও সম্পত্তিবিভাগ ৬৯

৩.২.৮ নারীর সামাজিক অবস্থান- নারীর মর্যাদা ৭৩

চতুর্থ অধ্যায় – যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক বিবরণ: ৭৫ - ৮৯

৪.১ শিক্ষাব্যবস্থা ৭৫

৪.১.১ পাঠ্যবিষয় ৭৫

৪.১.২ আচার্য ৭৭

৪.১.৩ সংস্কারসমূহ ৭৮

৪.২ স্বাস্থ্যব্যবস্থা ৮৩

৪.২.১ ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য ৮৪

৪.২.২ শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা ৮৮

পঞ্চম অধ্যায় – যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রে প্রতিফলিত ধর্ম ও সংস্কৃতি: **৯০ - ১৩৪**

৫.১ ধর্ম ৯০

৫.১.১ পৌরোহিত্য-দেবতা-একেশ্বরবাদ ৯০

৫.১.২ যাগযজ্ঞ- আচার-অনুষ্ঠান-ব্রত-পঞ্চমহাযজ্ঞ ৯১

৫.১.৩ পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত ৯৯

৫.১.৪ বিবাহ ১১৪

৫.১.৫ শ্রাদ্ধ ১২৪

৫.১.৬ অশৌচবিধি ১২৬

৫.২ সংস্কৃতি ১৩১

৫.২.১ ক্রীড়া ও আমোদ-প্রমোদ ১৩১

৫.২.২ পরিধেয়-পরিচ্ছদ-অলঙ্করণ ও প্রসাধন ১৩২

ষষ্ঠ অধ্যায় - উপসংহার: **১৩৫ - ১৪১**

গ্রন্থপঞ্জি: **১৪২ - ১৪৫**

নির্ঘণ্ট: **১৪৬ - ১৭৪**

পদসংকেত

অ. বে.	=	অথর্ববেদ সংহিতা
আ. ধ. সূ.	=	আপস্তম্ব ধর্মসূত্র
ঐ. ব্রা.	=	ঐতরেয়ব্রাহ্মণ
ঋ. বে.	=	ঋগ্বেদ-সংহিতা
গৌ. ধ. সূ.	=	গৌতম-ধর্মসূত্র
ছা. উ.	=	ছান্দোগ্য-উপনিষদ
তৈ. ব্রা.	=	তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ
ধ. শা. ই.	=	ধর্মশাস্ত্র কা ইতিহাস
নি.	=	নিরুক্ত
প. ব্রা.	=	পঞ্চবিংশ-ব্রাহ্মণ
প. স্মৃতি.	=	পরাশরস্মৃতি
পা. শি.	=	পাণিনীয় শিক্ষা
বি. ধ. সূ.	=	বিষ্ণু-ধর্মসূত্র
বৌ. ধ. সূ.	=	বৌধায়ন-ধর্মসূত্র
বৈ. য.	=	বৈদিক যজ্ঞ

ম. উ.	=	মুণ্ডক উপনিষদ
মনু.	=	মনুসংহিতা
মহা.	=	মহাভারত
যা. সং.	=	যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা
লঘু. সি. কৌ.	=	লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী
শত. ব্রা.	=	শতপথ ব্রাহ্মণ
শু. যজুঃ.	=	শুক্ল যজুর্বেদ
হি. ধ. সূ.	=	হিরণ্যকেশী ধর্মসূত্র
HIL	=	History of Indian Literature
IVK	=	India of Vedic Kalpasūtras
SBE	=	Sacred Book of the East

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১- অবতরণিকা (Preface):

বৈদিক সাহিত্যের পরিসর অত্যন্ত বিপুল এবং এ সম্পর্কে কৌতূহল, জিজ্ঞাসা, ও বিবিধ বিচার-পদ্ধতি নিয়ে প্রাচীন (Traditional) এবং আধুনিক (Modern) গবেষকদের গবেষণা-কর্মের পরিমাণ কম নয়। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্, নানাবিধ শাখা- ইত্যাকার পৃথুলতায় বৈদিক সাহিত্যের সীমা-নির্ধারণ, কাল-নির্ধারণ কোনও কিছুতেই ঐকমত্য দৃষ্ট হয় না। সেই প্রাচীনকালে যে বলা হয়েছিল ‘বেদা বৈ অনন্তাঃ’ এবং একসময় কালগর্ভে তার বিপুল অংশ লেখার অভাবে লুপ্ত হয়ে গেলেও, যা পড়ে আছে তার মধ্যেও অনন্ত জিজ্ঞাসা, সংশয়, বিচার অদ্যাবধি বিদ্যমান। শুধু সংহিতা থেকে উপনিষদ্ পর্যন্ত যে এর ব্যাপ্তি তা-ও নয়, ‘ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মঃ ষড়ঙ্গবেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ’ বলে পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যের শুরুতেই জানালেন যে, শুধু বেদ নয়, বেদাঙ্গও অধ্যয়নের, চর্চার বিষয়। আসলে সকলেই জানেন যে বেদের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের কারণে তাকে অভ্রান্তভাবে উচ্চারণগত ও অর্থগতভাবে রক্ষা করা ও বেদবিষয়ক কর্মসমূহকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বেদাঙ্গের উৎপত্তি। শ্রৌতকর্মসমূহ, গৃহস্থের কর্ম, সামাজিকের কর্ম ইত্যাকার বিবিধ তত্ত্বকে মেনে চলার তাগিদ থেকেই বহু ধরনের ষড়বেদাঙ্গের উদ্ভব। আমরা এই বিপুলতার মধ্যে ধর্মসূত্র-সমূহ - যা মানুষকে সামাজিক জীব হিসেবে একত্রে সহবাসের শিক্ষা ও বিধান দেয় - সেই বিষয়কে কেন্দ্র করে একটি গবেষণা-সন্দর্ভ প্রস্তুত করার চেষ্টা করব। তার মধ্য থেকে পরবর্তী শাস্ত্রে এমনকি বর্তমান সমাজে তার প্রাসঙ্গিক

দিকগুলিও আমাদের বিচার্যের মধ্যে আসবে। ফলতঃ প্রাচীন ভারতীয় সমাজে ও তার পরবর্তী কালে তার অনুবর্তন- সবই আধারীকৃত করার প্রয়াস থাকবে।

১.২- বিষয়বস্তু (Content):

বেদ যে জ্ঞানরাশির ভাণ্ডার- সে বিষয়ে সংশয়ের কোনও অবকাশ নেই। ভারতীয় জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রের সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে বেদের সম্বন্ধ রয়েছে। বেদ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। বেদ শব্দটি বিদ্ ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ পরম জ্ঞান। এছাড়াও বিদ্ ধাতুর আরও তিনরকম অর্থ রয়েছে। যেমন - সত্তা, লাভ ও বিচার।[১] জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় যোগে বেদ শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। বেদের লক্ষণ বিষয়ে আচার্য যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন -

‘প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে।

এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা।।’[২]

অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করবার কোনও উপায় নেই, সেই অতীন্দ্রিয় পরম জ্ঞান বেদ থেকে লাভ করা যায়। আর এটিই হল বেদের বেদত্ব।

বেদ চারপ্রকার। সেগুলি হল - *ঋগ্বেদ*, *সামবেদ*, *যজুর্বেদ* এবং *অথর্ববেদ*। *ঋগ্বেদে* জ্ঞানের, *সামবেদে* উপাসনার, *যজুর্বেদে* কর্মের এবং *অথর্ববেদে* জ্ঞান, কর্ম, উপাসনা তিনটি বিষয় বর্ণিত আছে। বিশ্বের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদের প্রথম ভাগ হল ঋগ্বেদ। ব্যাসদেবের নিকট থেকে প্রথম *ঋগ্বেদের* শিক্ষা লাভ করেছিলেন পৈল।

---

[১] সত্তাযাং বিদ্যতে জ্ঞানে বেত্তি বিন্তে বিচারণে।

বিন্দতে বিন্দতি প্রাপ্তৌ শ্যনলুকশ্নম্পেম্বিদং ক্রমাৎ।। সি. দ্বি. খ. পৃ -২৫৫

[২] ঐতরেয়ব্রাহ্মণভাষ্যভূমিকা।

যজুর্বেদের প্রথম শিক্ষা লাভ করেছিলেন বৈশম্পায়ন। *সামবেদের* প্রথম শিক্ষা লাভ করেছিলেন জৈমিনি এবং *অথর্ববেদের* শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন সুমন্ত্ত।

*যজুর্বেদ*কে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়- প্রথমটি হল *কৃষ্ণযজুর্বেদ*, দ্বিতীয়টি *শুক্লযজুর্বেদ*। চারটি বেদের মোট **১১৩১** টি শাখা আছে বলে মনে করা হয়। এর মধ্যে *ঋগ্বেদের* ২১ টি শাখা, *যজুর্বেদের* ১০১ টি শাখা, *সামবেদের* ১০০০ শাখা এবং *অথর্ববেদের* ৯ টি শাখা। প্রত্যেক বেদের পৃথক্ পৃথক্ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ পাওয়া যায়। *ঋগ্বেদের* দুটি ব্রাহ্মণ গ্রন্থ পাওয়া যায় সেগুলি হল – *ঐতরেয়* ও *কৌষীতকি* বা *শাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ*। সব থেকে বেশি ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় *সামবেদে*। সেগুলি হল- *পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ* বা *তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ* বা *প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ*, *ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ*, *ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ*, *জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ*, *সামবিধান ব্রাহ্মণ*, *দেবতাধ্যায় ব্রাহ্মণ*, *আর্ষেয় ব্রাহ্মণ* ও *বংশ ব্রাহ্মণ*। *শুক্লযজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ* এবং *কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ* পাওয়া যায়। *অথর্ববেদের* একটিই ব্রাহ্মণ, তার নাম *গোপথ ব্রাহ্মণ*।[৩]

বস্তুত আরণ্যক গ্রন্থ ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের শেষ ভাগ। 'অরণ্যে উক্তমিতি ইতি আরণ্যকম্'[৪] অর্থাৎ যা অরণ্যে উক্ত হয় তাই আরণ্যক। আরণ্যক গ্রন্থ উপনিষদের প্রারম্ভিক ভাগও।

বেদের অর্থ জানবার জন্য বেদাঙ্গের জ্ঞান থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। এই বেদাঙ্গের ছয়টি শ্রেণী। সেগুলি হল- শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ এবং

---

[৩] বে.পি. পৃ- ২৬

[৪] বে.পি. পৃ- ১৪

জ্যোতিষ।[৫] এই বেদাঙ্গকে বেদ-পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যেমন কোনও একটি অঙ্গ ছাড়া মানুষের শরীর সম্পূর্ণ হয় না, তেমনি বেদের জ্ঞান এই ছয়টি বেদাঙ্গ ছাড়া সম্পূর্ণ হবে না। বৈদিক মন্ত্রগুলি স্বরের নিয়মের অনুসারে উচ্চারণ করতে গেলে শিক্ষা নামক বেদাঙ্গের প্রয়োজন। বেদের মুখ্য প্রয়োজন হল কর্মকাণ্ড, যার বর্ণনা কল্প নামক বেদাঙ্গে করা হয়েছে। সাধু শব্দের জ্ঞানের জন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন অনিবার্য। বৈদিক পদের নির্বচনের জ্ঞান নিরুক্ত থেকে পাওয়া যায়। বেদমন্ত্র পাঠ করতে ছন্দের একান্ত জ্ঞান আবশ্যক। যজ্ঞের অনুষ্ঠান উপযুক্ত কাল অনুসারে হয়, এর জন্য যথোচিত সময়, বর্ষ, নক্ষত্র, ঋতু ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান জ্যোতিষ বেদাঙ্গের দ্বারাই অর্জন হয়।

বেদাঙ্গ সাহিত্যে কল্পসূত্রের স্থান অদ্বিতীয়। যার দ্বারা যজ্ঞাদি কল্পিত ও সমর্থিত হয় তাকে কল্প বলে। আচার্য সায়ণ বলেছেন- 'কল্প্যতে সমর্থ্যতে যাগপ্রয়োগোঽত্র'।[৬] *পাণিনীয় শিক্ষায়* কল্পসূত্রকে বেদপুরুষের হস্তরূপে কল্পনা করা হয়েছে- "হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে"।[৭] কল্পের মধ্য দিয়ে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রক্রিয়া সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে ব্রাহ্মণের সঙ্গে কল্পশাস্ত্রের সাদৃশ্য আছে, তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। তাই কল্পশাস্ত্রকে ব্রাহ্মণেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা হয়। এই কল্পসূত্রকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলি হল - শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র ও শুল্বসূত্র। প্রত্যেক বেদের শাখা অনুসারে পৃথক

---

[৫] শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি। মু. উ. ১/১/৫

[৬] ঋ. ভা

[৭] পাণিনীয়শিক্ষা. ৪১

পৃথক শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র এবং শুল্বসূত্র ছিল। বর্তমানে অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে।

শ্রৌতসূত্র:

ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বিহিত ও বিবৃত শ্রৌত যজ্ঞের বিধি, নিয়মাদি যে সকল সূত্রে গ্রথিত হয়েছে তাদের শ্রৌতসূত্র বলে। বর্তমানে যে সকল শ্রৌতসূত্রের উল্লেখ আমরা পাই, সেগুলি হল যথাক্রমে *ঋগ্বেদের*- আশ্বলায়ন, শাংখ্যায়ন; সামবেদের- লাট্যায়ন, দ্রাহ্যায়ণ, জৈমিনীয়; *কৃষ্ণযজুর্বেদের*- বৌধায়ন, আপস্তম্ব, বৈখানস; *শুক্লযজুর্বেদের*- কাত্যায়ন; এবং *অথর্ববেদের* বৈতান শ্রৌতসূত্র প্রধান।

গৃহ্যসূত্র:

গৃহস্থের করণীয় সংস্কার বা যাগাদি যেখানে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ আছে তাদের গৃহ্যসূত্র বলে। বর্তমানে যে সকল গৃহ্যসূত্র পাওয়া যায় সেগুলি হল- *ঋগ্বেদের*- আশ্বলায়ন, শাংখ্যায়ন, কৌষীতকি; *সামবেদের*- জৈমিনীয়, খাদির, গোভিল; *কৃষ্ণযজুর্বেদের*- বৌধায়ন, আপস্তম্ব, বাধূল, ভারদ্বাজ; *শুক্লযজুর্বেদের*- পারস্কর, এবং *অথর্ববেদের* কৌশিকসূত্র।

ধর্মসূত্র:

ধর্মসূত্রে ধর্মসম্বন্ধীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ- উভয়বিধ বিধিনিষেধাদি লিপিবদ্ধ আছে। চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রম সংক্রান্ত বিধিনিয়ম ধর্মসূত্রকারগণ বর্ণনা করে গিয়েছেন। বর্তমানে যে ধর্মসূত্রগুলি পাওয়া যায় সেগুলি হল- *ঋগ্বেদের*- বসিষ্ঠ; *সামবেদের*-

গৌতম; *শুক্লযজুর্বেদের*- হিরণ্যকেশী, মানব, শঙ্খলিখিত; *কৃষ্ণযজুর্বেদের*- বৌধায়ন, আপস্তম্ব, বিষ্ণু এবং হারীত।

শুল্বসূত্র:

বিবিধ প্রকারের যজ্ঞবেদী নির্মাণকালে ভূমির পরিমাপ এবং বৃত্তাকার, অর্ধবৃত্তাকার, চতুষ্কোণ, ত্রিকোণাকৃতি প্রভৃতি বিবিধ আকার নির্ধারণের জন্য যে সকল প্রণালী অবলম্বন করা হত তা শুল্বসূত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বর্তমানে যে শুল্বসূত্রগুলির উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলি হল- *কৃষ্ণযজুর্বেদের* কাত্যায়ন, আপস্তম্ব ও বৌধায়ন। বেদাঙ্গ সাহিত্যের মধ্যে কল্পসূত্র যাগযজ্ঞ বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

১.৩- সাহিত্য-পর্যালোচনা (Literature Review):

History of Dharmaśāstra

P. V. Kane

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত পণ্ডিত হলেন পি. ভি. কাণে। ভারতীয় সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা ও মৌলিকতার প্রতি তিনি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক অবদান হল *ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস* গ্রন্থটি। মূলত পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থটি ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের একদিকে যেমন পেয়েছি ধর্ম শব্দের অর্থ, ধর্ম শব্দের উৎস, ধর্মসূত্র কাকে বলে, ধর্মশাস্ত্র কাকে বলে, ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য, প্রত্যেক বেদের কি কি ধর্মসূত্র রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা, তেমনি পেয়েছি রাজধর্ম সম্পর্কিত নানান

তথ্য, ব্যবহার ন্যায় পদ্ধতি এবং সদাচার। এখানে আলোচিত হয়েছে পাতক, প্রায়শ্চিত্ত, কর্মবিপাক, অনয়কর্ম, তীর্থপ্রকরণ প্রসঙ্গ, আবার ঋগ্বেদের ব্রত-সহ বৈদিক সাহিত্যের নানান ব্রতের উল্লেখও আমরা এখানে পেয়েছি। তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত এবং ধর্মশাস্ত্র, পূর্বমীমাংসার কিছু মৌলিক সিদ্ধান্ত, ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত মীমাংসা সিদ্ধান্ত। ধর্মশাস্ত্র এবং সাংখ্য, যোগ এবং ধর্মশাস্ত্র, তর্ক এবং ধর্মশাস্ত্র, হিন্দু সংস্কৃতি এবং সভ্যতার মৌলিক এবং মুখ্য বিশেষতার মতো বিষয়গুলির আলোচনায় পণ্ডিত পি ভি কাণে মহাশয় বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। এই গবেষণা কর্মের অন্যতম আকর হয়ে উঠেছে গ্রন্থটি। নানাবিধ তথ্যের বিন্যাস এবং লেখকের নিজস্ব গবেষণাধর্মী পরিমার্গ, ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক চিন্তাচর্চায় আদর্শস্বরূপ। আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভটিতে এই বিশ্লেষণাত্মক পরিমার্গটিকে যেমন গ্রহণ করা হয়েছে, তেমনি প্রাপ্ত তথ্যগুলিকেও প্রয়োজন সাপেক্ষে ব্যবহার করা হয়েছে।

India of Vedic Kalpasūtras

Ram Gopal

রাম গোপাল মহোদয়ের *India of Vedic Kalpasūtras* নামক গ্রন্থটি ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। এখানে সকল প্রকার শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্মসূত্রের উপর ভিত্তি করে তৎকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় প্রভৃতি বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে আমরা প্রাচীন ভারতের আর্থ-সামাজিক এবং ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারি। আলোচ্য গবেষণা কর্মে উক্ত ধারণা গুলিকে প্রয়োজন অনুসারে প্রামান্য রূপে গ্রহণ করা

হয়েছে। বৈদিক কল্পসূত্রে বর্ণিত সমকালীন সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত আচার অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় আইনের যে ভিত্তি আমরা লক্ষ্য করেছি, তারই বিস্তারিত এবং বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার অবকাশ আমরা এই গবেষণা কর্মে পেয়েছি।

আপস্তম্ব-ধর্মসূত্রম্

(সম্পা) উমেশচন্দ্র পাণ্ডেয়

উমেশচন্দ্র পাণ্ডেয় মহোদয়ের *আপস্তম্ব-ধর্মসূত্রম্* নামক গ্রন্থটি ২০১৬ সালে পুনর্মুদ্রিত হয় চৌখম্বা সংস্কৃত সংস্থান থেকে। মূল গ্রন্থটি দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে একাদশটি পটল আছে ও দ্বিতীয় ভাগেও একাদশটি পটল আছে। সাময়াচারিক ধর্ম ও ধর্মের প্রমাণ, বর্ণ, কর্তব্য, উপনয়ন, বেদ অধ্যায়নের ফল, গুরুর প্রতি শিষ্টাচারের নিয়ম, সমাবর্তন, অনাধ্যায়ের নানাবিধ নিয়মাবলি, চতুরশ্রমের বর্ণনা, ভক্ষ অভক্ষের নিয়মাবলী, যোগের উপদেশ, অত্মজ্ঞানের মহত্ব প্রভৃতি বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও এখানে উল্লিখিত হয়েছে দানের নিয়ম, নানা বিধ প্রায়শ্চিত্ত, মায়ের শুশ্রুষার নিয়ম, ব্রহ্মচর্য অবধি, ব্রত, অধ্যাপকের নিয়ম, পত্নীগমনের নিয়ম, বর্ণধর্ম আর স্বর্গফল, বৈশ্বদেব কর্ম, হোমকর্মের নিয়ম, ভোজন করার নিয়ম, বর্ণ অনুসারে অভিবাদনের নিয়ম, অতিথি সৎকারের নিয়ম, মধুবর্গের অধিকারি, সম্পত্তি বিভাজন, উত্তরাধিকারের প্রশ্ন, মৃত্যুর পরে অশৌচ, শ্রাদ্ধ বিষয়ক নানা নিয়ম, আত্ম থেকে মোক্ষ প্রাপ্তি, রাজার কর্তব্য, দূত ব্যবস্থা, উত্তম রাজা, কর গ্রহণের নিয়ম, ব্যাভিচারের নিয়ম, নানা প্রকার দণ্ড ও তা থেকে রক্ষা পাওয়ার নিয়ম, সাক্ষীর বিচার, ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাপ্ত এই তথ্যসমূহকে

গবেষণার উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে এবং এই উপকরণগুলিকেই উদ্দেশ্য অনুসারে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা গেছে।

বৌধায়ন-ধর্মসূত্রম্

(সম্পা) উমেশচন্দ্র পাণ্ডেয়

এছাড়াও উমেশচন্দ্র পাণ্ডেয় মহোদয়ের *বৌধায়ন-ধর্মসূত্রম্* নামক গ্রন্থটি ২০১৭ সালে পুনর্মুদ্রিত হয় চৌখম্বা প্রকাশন থেকে। মূল গ্রন্থটিকে চারটি প্রশ্নে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রশ্নকে আবার অনেকগুলি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এই গ্রন্থে-- ধর্ম, আর্যাবর্তের বিস্তার, অগ্নির আধানের কাল, পুরোহিতের মহত্ত্ব, উপনয়নের সংস্কার, ব্রহ্মচারীর কর্তব্য, অভিবাদনের নিয়ম, নানা প্রকার মন্ত্র জপ্, প্রাণায়ম, উপদেশ যোগ্য শিষ্য, ব্রহ্মচর্য, স্নাতকের নানা বিধ নিয়ম, শুদ্ধি ও অশুদ্ধি, আচমনের বিধি, দেব পূজায় শ্রদ্ধার মহত্ত্ব, ব্যাজের নিয়ম, বর্ণের হানি, অশৌচের নিয়ম, সকুল্য, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, অস্পৃশ্য ব্যক্তি এবং বস্তু, ভক্ষণ ও অভক্ষণ, পবিত্রতার মহত্ত্ব, যজ্ঞের সামান্য নিয়ম ও বস্ত্র, দীক্ষিতের কর্তব্য, ব্রাহ্মণের পত্নী, পুত্রের প্রকার, ব্রাত্য সন্তান, কর, বিশিষ্ট বর্ণের কর্ম, দণ্ড, বিবাহের ভেদ, পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত, ভ্রূণ হত্যা, বধ, বিক্রিয়ার্থ নিষেদ্ধ বস্তু, সম্পত্তি বিভাজন, স্ত্রীর পরতন্ত্রতা, স্ত্রীর ধর্ম, স্নানের নিয়ম, দানের নিয়ম, ভোজনের বিধি, তর্পন, পঞ্চমহাযজ্ঞ, বানপ্রস্থের কর্তব্য, পরিব্রাজকের কর্তব্য, ব্রাহ্মণের মহিমা, আত্মযজ্ঞ, উপবাস, শ্রাদ্ধ, ত্রিবিধ ঋণ, পুত্র উৎপত্তির মহত্ত্ব, সন্ন্যাসের নিয়ম, নানা প্রকার ব্রত ও ব্রতে নিষিদ্ধ কর্ম, আত্মযজ্ঞ, নানা প্রকার বৃত্তি, বানপ্রস্থের ভেদ, বৈখানসের নিয়ম,

বনবাসের প্রশংসা, অঘমর্ষণ, প্রসৃতযাবক, যবের প্রশস্তি, অনুচিত, অগ্নি পরিচর্যা, অগ্নিহোত্রীর জন্য কর্ম, লৌকিক অগ্নির রক্ষা, ঘুমের মন্ত্র, হবনের মন্ত্র, পাপকর্ম থেকে দোষ, দান যোগ্য বস্তু, প্রাণায়মের বিধি, কন্যার দ্বারা প্রতি বরণ, কন্যার অপহরণ, যোগের মহত্ত্ব, ধর্মশাস্ত্রে উপদেশযোগ্য ব্যক্তি, ভক্ষ, গণহোম মন্ত্র, গণহোমের মহত্ত্ব, ধর্মশাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা দোষির শান্তি ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য তথ্যাবলী আলোচ্য গবেষণায় উপযোগী সহায়ক হয়ে উঠেছে। বিষয় সুনির্দিষ্ট ও সংগতিপূর্ণ হওয়ায় এই যথার্থতা এবং নির্ভরযোগ্যতা যে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা স্বীকার না করলেই নয়।

১.৪- গবেষণাবকাশ (Research Gap):

বিদ্যায়তনিক চর্চায় বিভিন্ন ধর্মসূত্রের ওপর বেশ কিছু গবেষণামূলক গ্রন্থ আমরা ইতঃপূর্বে লক্ষ্য করেছি। গবেষক রাকেশ কুমার শর্মার 'গৌতম-ধর্মসূত্র: এক অনুশীলন', গবেষক জগদীশের 'বসিষ্ঠ ধর্মসূত্র: এক অনুশীলন' কিংবা গবেষক রজনী ভরদ্বাজের 'বৌধায়ন ধর্মসূত্র: এক অনুশীলন' ইত্যাদি বিদ্যায়তনিক গবেষণাকর্ম আমাদের নজরে এসেছে। তবে যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্র বিষয়ে সামগ্রিক গবেষণামূলক আলোচনা আমরা খুঁজে পাইনি। এই অভাববোধ থেকেই 'যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রসমূহে প্রতিফলিত প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি: একটি সমীক্ষা' বিষয়ক গবেষণায় মনোনিবেশ করা হয়েছে। আমরা যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্র রচনার সমকালীন ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিত্রকে তুলে ধরতে চেয়েছি। বর্তমান আলোচনার

পরিধিতে এক্ষেত্রে চতুর্বর্ণের কর্তব্য ও অধিকার, রাজার কর্তব্য ও দায়িত্ব, প্রায়শ্চিত্ত, শিক্ষা, ব্রত, আচার-অনুষ্ঠান, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, ধর্মীয় বিষয়, যাগযজ্ঞ, হোম, বিচার-ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১.৫- গুরুত্ব (Importance):

চতুর্বেদ অর্থাৎ ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব- এদের মধ্যে ঋক্, সাম ও যজুঃ- এই তিনটি বেদের অন্তর্গত বিভিন্ন ধর্মসূত্রগুলি সম্পর্কে ইতঃপূর্বে যে সকল চিন্তাচর্চার পরিসর আমরা লক্ষ্য করেছি তা অনেকাংশেই খণ্ডিত এবং ক্ষেত্রবিশেষে কখনও কখনও একদেশদর্শী মনোভাবাপন্ন। আমরা লক্ষ্য করেছি ঋগ্বেদের অন্তর্গত বসিষ্ঠ ধর্মসূত্র, সামবেদের অন্তর্গত গৌতম ধর্মসূত্র নিয়ে গবেষণা-কর্ম ইতোমধ্যে সম্পাদিত হয়েছে। আবার যজুর্বেদের অন্তর্গত বৌধায়ন ধর্মসূত্র নিয়েও গবেষণা কার্য সম্পাদিত হয়েছে। সুতরাং যজুর্বেদের অন্তর্গত যতগুলি ধর্মসূত্র রয়েছে, তাদের মধ্যে বৌধায়ন ব্যতিরেকে অন্যান্য ধর্মসূত্রগুলিকে কেন্দ্র করে কোনওরকম পর্যালোচনা আমাদের চোখে পড়েনি। এই অভাববোধ থেকেই যজুর্বেদের অন্তর্গত সকল ধর্মসূত্র নিয়ে সামগ্রিক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়েছে।

যজুর্বেদের সমকালে ভারতবর্ষে সমাজব্যবস্থা কেমন ছিল তা জানা একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া বৈদিক আচরণের সঙ্গে যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রের যোগ বেশি থাকায়, সে বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনারও অবকাশ রয়েছে। যজুর্বেদের সঙ্গে সম্পর্কিত ধর্মসূত্রগুলিতে একটু গভীর ভাবে মনোনিবেশ করলেই বোঝা যাবে সমকালীন সমাজের প্রবহমান যাপনচিত্রের একটি সামগ্রিক রূপ। চতুর্বর্ণে বিভক্ত সমাজের স্বতন্ত্র স্তর, আচরণীয় ধর্ম-কর্তব্য, যজন-যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, রীতিনীতি,

পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, প্রশাসনিক অনুশাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষাব্যবস্থা- এসবকিছু নিয়েও গভীরভাবে চিন্তাচর্চার গুরুত্ব রয়েছে।

১.৬- পূর্বানুমান (Hypothesis):

যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রসমূহে প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে একটি সামগ্রিক ধারণা অর্জনই আমাদের আলোচ্য গবেষণার মূল লক্ষ্য। তবে প্রাথমিক পর্বে বেদাঙ্গ সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এবং ধর্মসূত্রসমূহের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলেও যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রকেই গবেষণার মূল আকর হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রে রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থার চিত্র বিশেষত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে শাসন-কাঠামো, অর্থনীতি, প্রশাসনিক ও সামরিক-সহ বিভিন্ন দিকগুলিকে যেমন তুলে ধরা হবে, তেমনি সামাজিক বর্ণ-ব্যবস্থা, জাতিভেদ প্রথা, বর্ণভেদে সামাজিক আইন কিংবা বিধি-বিধানগুলির তারতম্যকে ফুটিয়ে তোলাও গবেষণাকর্মটির একটি মূল দিক হয়ে উঠবে। আমরা যেমন যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রে উল্লিখিত সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থা কিংবা স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার চিত্রকে এখানে তুলে ধরব তেমনি এই ধর্মসূত্রে প্রতিফলিত সমকালীন ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও একটি সম্যক ধারণা লাভের চেষ্টা করব। আধুনিক ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত রীতিনীতি, প্রবহমান সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো কিংবা রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তনকে জানতে হলে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি বিশেষ করে বৈদিক যুগ সম্পর্কেও বিস্তারিত পাঠ আবশ্যক। ধর্মসূত্রগুলি এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক মাধ্যম- এ কথা অনস্বীকার্য। যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রে উল্লিখিত সমাজ ও সংস্কৃতির বিস্তারিত আলোচনার মধ্য দিয়ে সেই যোগসূত্রকে অন্বেষণ করাও আলোচ্য গবেষণাকর্মটির অন্যতম উদ্দেশ্য।

১.৭- গবেষণাপদ্ধতি (Methodology):

গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করার জন্য বিশ্লেষণাত্মক (Analytical) ও তুলনামূলক (Comparative) - উভয় পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। সেক্ষেত্রে আকরগ্রন্থ এবং সহায়ক গ্রন্থগুলিকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে ব্যবহার করা হবে। তাছাড়া বিভিন্ন গবেষণা-পত্রিকা এবং অন্তর্জাল থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে আধুনিক পদ্ধতি এবং বিদ্যায়তনিক চর্চার মান্য রীতি অনুসারেই ব্যবহার করা হবে। ভূমিকা, মূল আলোচনা, উপসংহার, পরিশিষ্ট ও গ্রন্থপঞ্জি- এই হল পাঁচটি পর্বে প্রদত্ত গবেষণাপত্রটির বিন্যাস। মূল আলোচনাকে আমরা মূলত চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করতে চাই। সেই অধ্যায়গুলির বিষয়বস্তু হল- বেদাঙ্গ সাহিত্যে ধর্মসূত্রের গুরুত্ব, রাষ্ট্র ও সমাজ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং ধর্ম ও সংস্কৃতি।

সম্পূর্ণ গবেষণাকার্যটির জন্য বাংলা ভাষায় রচনা করা হবে। গবেষণাপত্রটির মূল ভাগ ইউনিকোড কালপুরুষ ফন্টে ১৪.৫ পয়েন্টে মুদ্রিত হবে। এছাড়া উদ্ধৃতিগুলিতে ১২ পয়েন্ট, শিরোনাম অংশে ১৫ পয়েন্ট স্থূলাক্ষরে ব্যবহার করা হবে। সমগ্র গবেষণাপত্রে পাঠসৌকর্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক পৃষ্ঠায় পাদটীকা ব্যবহার করা হবে এবং উদ্ধৃতিগুলিতে উদ্ধৃতিচিহ্ন বর্জন করা হবে। বানানের ক্ষেত্রে গবেষণাপত্রটিতে আকাদেমি বানান অভিধান বিধি অনুসৃত হবে। গ্রন্থপঞ্জি নির্মাণের ক্ষেত্রে MLA হ্যাণ্ডবুক-এর মান্য পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।

মূল গবেষণার কেন্দ্রবিন্দুতে যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্র থাকলেও প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য ধর্মসূত্রের মতও তুলনামূলক আলোচনা করা হবে। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে উল্লিখিত তথ্যের সাপেক্ষে যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রের বিভিন্ন প্রসঙ্গকে সাদৃশ্য এবং

বৈসাদৃশ্যের মধ্য দিয়ে এনে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা হবে। অন্যদিকে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির রীতি মেনে যুক্তি ও আদর্শের সংমিশ্রণে একটি সমন্বিত রূপ দানের চেষ্টা করা হবে।

১.৮ অধ্যায়-বিভাজন (Chapter division):

সমগ্র গবেষণা নিবন্ধটি আমরা মূলত ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করব। ভূমিকা আংশটিকে প্রথম অধ্যায় রূপে ধরা হবে, তার মধ্যে আলোচনা করা হবে গবেষণা পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়গুলি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের নামকরণ বেদাঙ্গ সাহিত্যে ধর্মসূত্রের গুরুত্ব। এখানে আলোচনা করা হবে বেদাঙ্গ-সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা, ধর্মসূত্র সমূহের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ এবং যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রের বিশেষত্ব। তৃতীয় অধ্যায়ের নামকরণ “যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রে রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার চিত্র”। এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হল- ভৌগোলিক বাসস্থান, গ্রাম ও নগর, জনপদসমূহ, রাজতন্ত্র, সমাজ, বর্ণব্যবস্থা, চতুরাশ্রম, সম্পত্তিবিভাগ ও নারীর সামাজিক অবস্থান। চতুর্থ অধ্যায়ের নামকরণ “যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক বিবরণ”। এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হল- শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠ্যবিষয়, আচার্য, সংস্কারসমূহ, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য, এবং পবিত্রতা-অপবিত্রতা বোধ। পঞ্চম অধ্যায়ের নামকরণ “যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রে প্রতিফলিত ধর্ম ও সংস্কৃতি”। এই অধ্যায়ের বিষয় যাগযজ্ঞ, পঞ্চমহাযজ্ঞ, পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অশৌচবিধি, ক্রীড়া ও আমোদ-প্রমোদ, পরিধেয় পরিচ্ছদ, অলংকার ও প্রসাধন। ষষ্ঠ অধ্যায় তথা উপসংহার অংশে পূর্ববর্তী প্রতি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার ও নতুন দিগ্ দর্শন করা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বেদাঙ্গ সাহিত্যে ধর্মসূত্রের গুরুত্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়
বেদাঙ্গ সাহিত্যে ধর্মসূত্রের গুরুত্ব

২.১- বেদাঙ্গ-সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

বেদপাঠের সহায়ক গ্রন্থগুলিকে বেদাঙ্গ নামে অভিহিত করা হয়। বৈদিক সাহিত্যকে অপরিবর্তিত রাখার কাজে বেদাঙ্গগুলির অবদান অপরিসীম। বেদ অধ্যয়নের সহায়ক রচনা রূপে বেদাঙ্গের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় *মুণ্ডকোপনিষদে*।[১] বেদের প্রত্যেকটি ভাগকে স্পষ্টভাবে জানবার ও অনুধাবন করবার জন্যে বেদাঙ্গের প্রয়োজন।

বেদাঙ্গ প্রধানত ছয়টি। সেগুলি হল- শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ। এই ছয়টি বেদাঙ্গকে বেদের ষড়ঙ্গ বলা হয়। প্রধানের বা অঙ্গীর যা উপকারক বা সহায়ক তাকেই অঙ্গ বলে। *পাণিনীয় শিক্ষা* গ্রন্থে এই ষট্ বেদাঙ্গকে বেদপুরুষের বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে -

‘ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে ।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে ।।
শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্ ।
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ।।’[২]

অর্থাৎ ছন্দ হল বেদের দুটি চরণস্বরূপ, কল্পসূত্র হল দুটি হাত, জ্যোতিষশাস্ত্র হল চক্ষু, নিরুক্ত হল কর্ণ, শিক্ষা হল নাসিকা এবং মুখ হল ব্যাকরণ। এই

---

[১] মু. উ. ১/১/৫

[২] পা. শি. ৪১, ৪২

বেদাঙ্গসমূহের যথার্থ জ্ঞানের ফলেই বেদের প্রত্যেকটি বিষয়ের জ্ঞান সম্ভব। অঙ্গ ব্যতীত যেমন অঙ্গীর বা শরীরধারীর পরিচয় পাওয়া অসম্ভব, তেমনি বেদাঙ্গ ব্যতীত বেদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়াও সম্ভব নয়।

ছয় বেদাঙ্গের মধ্যে শিক্ষাকে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাবিষয়ক রচনাগুলিতে আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষে ধ্বনিতত্ত্বের অনুশীলন সম্পর্কে নানাবিধ পরিচয় পাই। শিক্ষাকে বেদের ধ্বনি-বিজ্ঞান বলা হয়।[৩] এই শাস্ত্রে বৈদিক মন্ত্রের বর্ণজ্ঞান, স্বর, মাত্রা ইত্যাদির যথাযথ উচ্চারণের নিয়মাদির উপদেশ পাওয়া যায়। বৈদিক মন্ত্রের যথাযথ উচ্চারণ, হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতভেদ, স্বর ও মাত্রার পার্থক্য, উদাত্ত-অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বরের সঠিক উচ্চারণ, বিভিন্ন বর্ণের উচ্চারণ স্থান ও প্রযত্ন-এগুলিই হল শিক্ষার আলোচ্য বিষয়। প্রত্যেক বেদের পৃথক পৃথক শিক্ষাগ্রন্থ ছিল বলে অনুমান করা হয়, যদিও বর্তমানে সমস্ত শিক্ষাগ্রন্থ সচরাচর আমরা খুঁজে পাই না। শিক্ষাগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *সামবেদের* 'নারদীয় শিক্ষা', *শুক্লযজুর্বেদের* 'যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষা', *অথর্ববেদের* 'মাণ্ডূকী শিক্ষা' ইত্যাদি। এছাড়াও আরও কতকগুলি গ্রন্থকে শিক্ষা নামে অভিহিত করা হয়। এগুলি হল *আপিশলি শিক্ষা, ভারদ্বাজ শিক্ষা, বসিষ্ঠ শিক্ষা* প্রভৃতি। বর্তমানে চল্লিশটির অধিক মুদ্রিত শিক্ষাগ্রন্থ পাওয়া যায়।

বেদমন্ত্র পাঠ করতে ছন্দের একান্ত জ্ঞান আবশ্যক। চতুর্বেদের অধিকাংশ মন্ত্রই ছন্দোবদ্ধ। ঋক্, সাম ও অথর্ব সংহিতার প্রায় সকল মন্ত্রই ছন্দে নিবন্ধ, কেবল *যজুর্বেদে* গদ্যময় মন্ত্রের ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। প্রধান বৈদিক ছন্দের সংখ্যা সাতটি। বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম নানা দৃষ্টান্ত থেকে অনুমান করা যায় যে

---

৩ H. I. L. Vol. 1, P- 262-263

ছন্দঃশাস্ত্রের উৎপত্তি অতি প্রাচীন। বর্তমানে এই শাস্ত্রের প্রাচীনতম যে গ্রন্থটি পাওয়া যায় তা পিঙ্গলমুনি বিরচিত *ছন্দঃসূত্র*। সুতরাং বেদাঙ্গের ছয়টি অঙ্গের মধ্যে ছন্দের যে স্বতন্ত্র গুরুত্ব রয়েছে, তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

বেদের শব্দশুদ্ধির জ্ঞানের জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাকরণশাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজন বোঝাবার জন্য *মহাভাষ্যের পস্পশাহ্নিকে* বলা হয়েছে- 'রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্'[৪] অর্থাৎ রক্ষা, ঊহ, আগম, লঘু ও অসন্দেহ- এই পাঁচটিই ব্যাকরণ অধ্যয়নের মুখ্য প্রয়োজন। ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকলে বেদ অধ্যয়ন কখনই সম্ভব নয়। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি তাঁর গ্রন্থে সকল বেদাঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণেরই প্রাধান্য স্বীকার করেছেন- 'প্রধানং চ ষট্স্বঙ্গেষু ব্যাকরণম্'।[৫] এই একই কারণে ব্যাকরণকে বেদের মুখ বলা হয়েছে- 'মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্'।[৬] সন্ধি, সমাস, প্রকৃতি, প্রত্যয়, শব্দরূপ, ধাতুরূপ, প্রভৃতি ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান না থাকলে ভাষাজ্ঞান কখনই সম্ভব নয়। এই কারণে বেদের যথার্থ জ্ঞানলাভের জন্য ব্যাকরণের জ্ঞান অপরিহার্য।

ছয় বেদাঙ্গের মধ্যে বেদপুরুষের শ্রোত্ররূপে নিরুক্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বৈদিক মন্ত্রের অর্থজ্ঞানের জন্য প্রয়োজনীয় বেদাঙ্গ নিরুক্ত। দুরূহ বৈদিক শব্দগুলির ব্যুৎপত্তিগত অর্থবিচার ও বহুমন্ত্রের অর্থজ্ঞান নিরুক্তের বিষয়বস্তু। কাজেই বেদের ছয়টি অঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশরূপে নিরুক্তকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি।

---

[৪] মহাভাষ্যম্. ৪

[৫] মহাভাষ্যম্. ৬

[৬] পা. শি. ৪২

বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের যথাযথ কাল নির্ধারণের জন্য জ্যোতিষ নামক বেদাঙ্গের জ্ঞান আবশ্যক। প্রত্যেক শ্রৌত ও গৃহ্যকর্মের অনুষ্ঠানের জন্য বিশিষ্ট তিথি, নক্ষত্র, রাশি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, সংবৎসর প্রভৃতি জ্ঞান না থাকলে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান অসম্ভব। কাজেই জ্যোতিষ নামক বেদাঙ্গেরও স্বতন্ত্র গুরুত্ব রয়েছে।

বেদাঙ্গ-সাহিত্যের মধ্যে কল্পসূত্র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। যার দ্বারা যজ্ঞাদি কল্পিত ও সমর্থিত হয় তাকে কল্প বলে। আচার্য সায়ণ বলেছেন- 'কল্প্যতে সমর্থ্যতে যাগপ্রয়োগোঽত্র'।[৭] বেদাঙ্গসাহিত্যে কল্পসূত্রের স্থান অদ্বিতীয়। *পাণিনীয়শিক্ষাতে* কল্পসূত্রকে বেদপুরুষের হস্তরূপে কল্পনা করা হয়েছে- 'হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে'।[৮] কল্পের মধ্যে দিয়ে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রক্রিয়া সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে ব্রাহ্মণের সঙ্গে কল্পশাস্ত্রের যে সাদৃশ্য আছে, তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। তাই কল্পশাস্ত্রকে ব্রাহ্মণেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা হয়। এই কল্পসূত্রকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলি হল- শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র এবং শুল্বসূত্র। প্রত্যেক বেদের শাখা অনুসারে পৃথক পৃথক শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র এবং শুল্বসূত্র ছিল। বর্তমানে অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে।

শ্রৌতসূত্র: ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বিহিত ও বিবৃত শ্রৌতযজ্ঞের বিধি, নিয়মাদি যে সকল সূত্রে গ্রথিত হয়েছে তাদের শ্রৌতসূত্র বলে। বর্তমানে যে সকল শ্রৌতসূত্রের উল্লেখ আমরা পাই সেগুলির মধ্যে *ঋগ্বেদের* আশ্বলায়ন, শাংখ্যায়ন, *সামবেদের* লাট্যায়ন,

---

[৭] ঋ. ভা. পৃ - ১৪৯

[৮] পা. শি. ৪১

দ্রাহ্যায়ণ, জৈমিনীয়, *কৃষ্ণযজুর্বেদের* বৌধায়ন, আপস্তম্ব, বৈখানস, *শুক্লযজুর্বেদের* কাত্যায়ন এবং *অথর্ববেদের* বৈতান শ্রৌতসূত্র প্রধান।

গৃহ্যসূত্র: গৃহস্থের করণীয় সংস্কার বা যাগাদি যেখানে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ আছে তাদের গৃহ্যসূত্র বলে। বর্তমানে যে সকল গৃহ্যসূত্র পাওয়া যায় সেগুলি হল *ঋগ্বেদের* আশ্বলায়ন, শাংখ্যায়ন, কৌষীতকি, *সামবেদের* জৈমিনীয়, খাদির, গোভিল, *কৃষ্ণযজুর্বেদের* বৌধায়ন, আপস্তম্ব, বাধূল, ভারদ্বাজ, *শুক্লযজুর্বেদের* পারস্কর এবং *অথর্ববেদের* কৌশিকসূত্র।

ধর্মসূত্র: ধর্মসূত্রে ধর্মসম্বন্ধীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ ও উভয়বিধ বিধিনিষেধাদি লিপিবদ্ধ আছে। চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রম সংক্রান্ত বিধি নিয়ম ধর্মসূত্রকারগণ বর্ণনা করে গিয়েছেন। বর্তমানে যে ধর্মসূত্রগুলি পাওয়া যায় সেগুলি হল *ঋগ্বেদের* বসিষ্ঠ, *সামবেদের* গৌতম, *শুক্লযজুর্বেদের* হিরণ্যকেশী, মানব, শঙ্খলিখিত এবং *কৃষ্ণযজুর্বেদের* বৌধায়ন, আপস্তম্ব, বিষ্ণু ও হারীত।

শুল্বসূত্র: বিবিধ প্রকারের যজ্ঞবেদী নির্মাণকালে ভূমিপরিমাপ এবং বৃত্তাকার, অর্ধবৃত্তাকার, চতুষ্কোণ, ত্রিকোণাকৃতি প্রভৃতি বিবিধ আকার নির্ধারণের জন্য যে সকল প্রণালী অবলম্বন করা হত তা শুল্বসূত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বর্তমানে যে শুল্বসূত্রগুলির সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলি হল- *কৃষ্ণযজুর্বেদের* কাত্যায়ন, আপস্তম্ব ও বৌধায়ন। বেদাঙ্গ সাহিত্যের মধ্যে কল্পসূত্র একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

২.২- ধর্মসূত্রসমূহের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

প্রথাগত ধারণা অনুযায়ী ‘ধর্ম’-কে বোঝাতে রিলিজিয়ন শব্দের ব্যবহার করা হলেও, ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে এমন কোনও শব্দের ব্যবহার নেই যার দ্বারা ‘ধর্ম’ শব্দের অর্থকে প্রকাশ করা যায়। আসলে প্রাচীন কালে ধর্মের প্রধান অবলম্বনই ছিল আচরণবিধি। ভারতীয় সংস্কৃতিতেও এই যাপনসংস্কৃতির ওপরেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সেই অর্থে কোনও জিনিসের স্বাভাবিক প্রকৃতিকেই ‘ধর্ম’ হিসেবে অভিহিত করতে হয়। মানুষের ক্ষেত্রেও তাই, এর মূলে অবস্থান করে ‘আচরণ বিধি’। এই বিধিনিষেধ বা ‘কোড অফ কন্ডাক্ট’-গুলিই বৈদিক যুগের শেষে ‘ধর্মসূত্র’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তার অর্থ হল- সে সময় থেকেই ধর্মের আচরণবিধির বিষয় বা সংকলনগুলিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। তবে বেদের প্রথম যুগের সময় ও পরিসর সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা কঠিন। ধর্মসূত্রের মূলত দুটি প্রধান দিক- আচার ও ব্যবহার। ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনকে এই আচার ও ব্যবহারের মানদণ্ডই পরিমাপ করে দেখে। জীবনকে তাই চারটি স্তরে ভাগ করা হল- ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস।

সামগ্রিকভাবে এই পর্যায় বিন্যাস যে সমাজের সকল স্তরের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তেমন নয়। মূলত ধর্মসূত্রের যুগে এসে তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আবার সমাজের বিভিন্ন অংশে কাজ বা দায়িত্ব অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের অবস্থান নির্ধারিত হলেও, ধর্মসূত্রের যুগে এসে তা একরকম নিয়মতান্ত্রিক প্রকোষ্ঠে পরিণত হয়। এরকম ভাবে বলা যায়- স্তর অনুসারে ‘কোড অফ কন্ডাক্ট’ নির্দিষ্ট হয় যাকে সক্রিয়ভাবে কার্যকরী করবার কাজটি করেছিল রাজা এবং ধর্মাধিকরণেরা।

ধর্মসূত্র থেকে যে সাহিত্যের পথ চলা শুরু হল, পরবর্তী সময়ে তার সুবিস্তৃতি ঘটে। পরবর্তী কালে আমরা পাই স্মৃতিসংহিতা। এছাড়াও রয়েছে শ্লোকে নিবদ্ধ *মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা*। স্মৃতিসংহিতা থেকে আসে স্মৃতি নিবন্ধ সেই ধারা সাম্প্রতিক কাল অবধি চলছে। সুতরাং এই ধারার উৎস হিসেবে ধর্মসূত্রের অবস্থান ও গুরুত্বকে স্বীকার করে নিতে হয়।

ধর্ম একরকম সুসজ্জিত আচরণবিধি। তবে ব্যক্তি বিশেষে ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান আপেক্ষিকও বটে। জীবনের এক পর্যায়ে যা ধর্ম অন্য পর্যায়ে তা ধর্ম হিসেবে নাও চিহ্নিত হতে পারে। বিভিন্ন ধর্মসূত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন প্রথা বা দেশাচার পরিবর্তিত হয়ে যায়। ফলে শাস্ত্রও পরিবর্তিত হয়ে যায়।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে 'ধর্ম' শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যবাহী। 'ধর্ম' শব্দটি কখনও কোনও একটি নির্দিষ্ট অর্থে স্থিত হয়নি, ভিন্ন ভিন্ন অর্থে, ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষায় 'ধর্ম' শব্দের অর্থ বিবর্তিত হয়েছে। ব্যাকরণ-প্রক্রিয়ায় ধৃ-ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় যোগে 'ধর্ম' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। ধৃ-ধাতুর বিভিন্ন অর্থ হয়, যেমন - ধারণ, অবলম্বন, পালন ইত্যাদি। একজন ব্যক্তি তাঁর জীবনে যত প্রকার বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেন সে সব মিলিয়ে হয় তার ধর্ম। তাঁর বিশ্বাস, পরম্পরাগত শিক্ষা, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সব কিছুই তাঁর ধর্ম। *মহাভারতে* উক্ত হয়েছে - 'তস্মাৎ ধারণাদ্ ধর্ম'[৯] অর্থাৎ যা ধারণ করে তাই ধর্ম। যেমন- আগুনের ধর্ম দহন করা, জলের ধর্ম শীতলতা, সমোচ্চশীলতা ইত্যাদি। সমাজে ব্যক্তির কী কী আচার-আচরণ করণীয়, কী

[৯] মহা. শা. প. ১০৬/১৫

কী কর্ম পালনীয়- সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সেই সমস্ত ব্যবহারিক নিয়মগুলি যেখানে আলোচিত হয়েছে, তাকে বলে ধর্মসূত্র। প্রাচীনকালে সূত্রাকারে যেগুলি লেখা হয়েছিল সেগুলিকে ধর্মসূত্র এবং অধিকতর বিস্তৃতভাবে পরবর্তীকালে যেখানে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে তাকে ধর্মশাস্ত্র বলে। উদ্দেশ্য ও ভাবনার দিক থেকে সাদৃশ্য থাকলেও ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রসমূহের মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ধর্মসূত্রগুলি প্রধানতঃ সূত্রাকারে গদ্যে রচিত। কোনও কোনও ধর্মসূত্রে পদ্যের মিশ্রণ থাকলেও এই সাহিত্যে গদ্যেরই প্রাধান্য। ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থগুলি অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত। কোনও কোনও টীকাকার গদ্যময় ধর্মশাস্ত্রের সন্ধান দিয়েছেন। কিন্তু সেগুলি বর্তমানে লুপ্ত। ধর্মসূত্র-সমূহের ভাষা, স্মৃতিগ্রন্থগুলির তুলনায় নিঃসন্দেহে প্রাচীনতর। ধর্মসূত্রে উপস্থাপিত বিষয়সমূহ অবিন্যস্ত। সে তুলনায় ধর্মশাস্ত্রের বিষয় অনেক বেশি সুবিন্যস্ত ও সুসংহত। ধর্মসূত্রগুলিতে বৈদিক কোনও কোনও শাখার প্রতি বিশেষ আনুগত্য পরিলক্ষিত হয়। সেগুলি বৈদিক কোনও শাখার সঙ্গে যুক্ত নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও উভয় সাহিত্যই বিষয়ভাবনায় এক। ধর্মসূত্রগুলিতে ভারতীয় বর্ণাশ্রমব্যবস্থা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, সম্পত্তির অধিকার, রাজধর্ম প্রভৃতি বিষয়সমূহ আলোচিত ও উপদিষ্ট হয়েছে। তবে বর্তমান সময়ে সব শাখার ধর্মসূত্র পাওয়া যায় না। গৃহ্যসূত্র ও শ্রৌতসূত্রের সঙ্গে ধর্মসূত্রসমূহের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। বেদের প্রত্যেক শাখার আলাদা আলাদা ধর্মসূত্র আছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে তা আমরা অল্প কিছু শাখায় প্রত্যক্ষ করে থাকি। আবার কোনও কোনও শাখায় তা খুঁজে পাওয়া যায় না। বর্তমান সময়ে যে ধর্মসূত্রগুলি পাওয়া যায় সেগুলি হল - *গৌতম ধর্মসূত্র, বসিষ্ঠ ধর্মসূত্র, বৈখানস ধর্মসূত্র, আপস্তম্ব ধর্মসূত্র, বৌধায়ন*

ধর্মসূত্র, বিষ্ণু ধর্মসূত্র, শঙ্খলিখিত ধর্মসূত্র, হারীত ধর্মসূত্র, মানব ধর্মসূত্র, হিরণ্যকেশী ধর্মসূত্র। পি. ভি কাণের মতানুসারে ধর্মসূত্রগুলির মধ্যে প্রাচীনতম ধর্মসূত্রগুলি হল - *গৌতম ধর্মসূত্র, বৌধায়ন ধর্মসূত্র* এবং *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র*। যেগুলির রচনাকাল ৬০০ - ৩০০ খ্রি. পূ.- এর মধ্যে বলে অনুমান করা হয়।[১০]

এই পর্বে আমরা বেদের প্রত্যেকটি ধর্মসূত্রের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করব। মূলত গৌতম, বসিষ্ঠ, বৈখানস, আপস্তম্ব, বৌধায়ন, বিষ্ণু, শঙ্খলিখিত, হারীত, মানব ও হিরণ্যকেশী ধর্মসূত্রের আভ্যন্তরীণ নানান বিষয় এবং বিশেষত সেই সকল ধর্মসূত্রের মধ্যে নানা বিভাগের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি থাকবে।

গৌতম ধর্মসূত্র: গৌতম ধর্মসূত্রের উৎস খুঁজতে গিয়ে আমাদের *সামবেদের* মুখোমুখি হতে হয়। *লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র* এবং *দ্রাহ্যায়ণ শ্রৌতসূত্রে* গৌতম নামক আচার্যের বর্ণনা একাধিকবার পরিলক্ষিত হয়। *গৌতম ধর্মসূত্রকে* অন্যান্য ধর্মসূত্রের তুলনায় প্রাচীন বলে মনে করা হয়।[১১] এই ধর্মসূত্র গদ্যে রচিত। অন্যান্য ধর্মসূত্রে শ্লোকের ব্যবহার থাকলেও এই ধর্মসূত্রে শ্লোকের ব্যবহার আমাদের চোখে পড়ে না। ধর্মসূত্রটি যে প্রাচীন তার প্রমাণ আমরা *বৌধায়ন ধর্মসূত্রের* উল্লেখেও বুঝতে পারি।[১২] পি. ভি. কাণে মহাশয়ের মতানুসারে অবশ্য আমরা এই *গৌতম ধর্মসূত্রের* রচনাকাল হিসেবে

---

[১০] ধ. শা. ইতি. প্রথম খণ্ড. পৃ - ৯,

[১১] বৌ. ধ. সূ. প্রস্থা - পৃ - ১১

[১২] ধ. শা. ইতি. প্রথম খণ্ড. পৃ - ১৩, গৌ.ধ. সূ. ভূমি -পৃ -১১

৬০০ খ্রি. পূ.-কে হিসেবে জানি।[১৩] *গৌতম ধর্মসূত্রের* তিনটি প্রশ্ন আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নে নয়টি করে অধ্যায় এবং তৃতীয় প্রশ্নে দশটি অধ্যায় আছে।[১৪]

আপস্তম্ব ধর্মসূত্র: এটি একটি প্রচলিত ধর্মসূত্র, যা *কৃষ্ণযজুর্বেদের* তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত। এই ধর্মসূত্রের ঋত্বিক্ হচ্ছেন অধ্বর্যু। পি.ভি. কাণে মহাশয় এই ধর্মসূত্রের রচনাকাল খ্রি. পূ. ৬০০ - খ্রি. পূ. ৩০০ বলে অনুমান করে থাকেন।[১৫] অধিকাংশ সূত্র গদ্যে লেখা, কোথাও কোথাও আবার শ্লোকও দেখা যায়। *আপস্তম্বীয় কল্পসূত্রের* সমগ্র সংকলনে তিরিশটি প্রশ্ন আছে। তার মধ্যে আঠাশ এবং ঊনত্রিশ সংখ্যক প্রশ্নগুলি আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের অন্তর্গত বলে জানা যায়। এই দুই প্রশ্ন আবার এগারোটি করে পটলে বিভক্ত এবং যথাক্রমে বত্রিশ ও ঊনত্রিশ কণ্ডিকায় বিভক্ত।

বৌধায়ন ধর্মসূত্র: এই ধর্মসূত্র *কৃষ্ণযজুর্বেদের* অন্তর্গত। সম্পূর্ণ আপস্তম্ব শাখাটি যেমন কল্পসাহিত্যে পাওয়া যায়, তেমনি বৌধায়ন শাখারও সমস্ত সূত্র কল্পসাহিত্যে উপলব্ধ হয়। তার উপযুক্ত প্রমাণ আমরা পাই *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে*।[১৬] *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* চারটি প্রশ্ন পাওয়া যায়। সেগুলিকে আবার কয়েকটি অধ্যায় ও খণ্ডে বিভক্ত করা হয়। প্রথম প্রশ্নে এগারোটি অধ্যায় ও একুশটি খণ্ড আছে। দ্বিতীয় প্রশ্নে দশটি অধ্যায় ও বারোটি খণ্ড আছে। তৃতীয় প্রশ্নে দশটি অধ্যায় ও দশটি খণ্ড আছে। চতুর্থ প্রশ্নে আটটি অধ্যায় ও আটটি খণ্ড আছে। *বৌধায়ন ধর্মসূত্র* অন্যান্য

[১৩] ধ. সূ. ইতি. প্রথম খণ্ড. পৃ- ১৬

[১৪] বৌ. ধ. সূ. প্রস্থা - পৃ - ১১

[১৫] ধ. শা. ইতি. প্রথম খণ্ড. পৃ- ২০

[১৬] বৌ. ধ. সূ. প্রস্থা - পৃ - ২২

ধর্মসূত্রের তুলনায় সহজ ও সরল।[১৭] *বৌধায়ন ধর্মসূত্রের* রচনাকাল খ্রি. পূ. ৫০০ থেকে খ্রি. পূ. ২০০ এর মধ্যে বলে মনে করা হয়।

বিষ্ণুধর্মসূত্র: *বিষ্ণুধর্মসূত্রকে* এক প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থ বলে মনে করা হয়। এই ধর্মসূত্রে ১০০ টি অধ্যায় আছে। এর মধ্যে প্রথম ও অন্য দুটি অধ্যায় পদ্যে লেখা। অন্যান্য অধ্যায়ে গদ্য-পদ্যের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। *বিষ্ণু ধর্মসূত্রকে* যজুর্বেদীয় কঠ শাখার অন্তর্গত বলা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করব এই ধর্মসূত্র থেকে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মনুস্মৃতি* ও *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে* অনেক কথা নেওয়া হয়েছে। *বিষ্ণু ধর্মসূত্রে* যেহেতু নানা কালের অংশ বিশেষের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাই এই ধর্মসূত্রের কাল নির্ণয় করা যথেষ্ট কঠিন। এই ধর্মসূত্রের সূত্রপাত খ্রি. পূ. ৩০০ থেকে ১০০ খ্রি. পূ. বলে অনুমান করা হয়।[১৮]

শঙ্খলিখিত ধর্মসূত্র: *শুক্লযজুর্বেদের* বাজসনেয়ী শাখার অন্তর্গত হল *শঙ্খলিখিত ধর্মসূত্র*। *তন্ত্রবার্তিক*-এ আলোচিত অনুষ্টুপ ছন্দের শ্লোকে এর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্য এবং পরাশর উভয়ই এর উল্লেখ করেছেন। জীবানন্দের *স্মৃতিসংগ্রহে* এই ধর্মসূত্রের আঠারোটি অধ্যায় এবং *শঙ্খ-স্মৃতিতে* ৩৩০টি এবং *লিখিত-স্মৃতিতে* ৯৩টি শ্লোক পাওয়া গেছে। এই ধর্মসূত্র গৌতম ও আপস্তম্বের পরবর্তী কালের। এই *শঙ্খলিখিত ধর্মসূত্রের* রচনা কাল খ্রি. পূ. ৩০০ থেকে ১০০ এর মধ্যে।[১৯]

---

[১৭] বৌ. ধ. সূ. প্রস্থা - পৃ - ২৪

[১৮] ধ. শা. ইতি. প্রথম খণ্ড. পৃ- ২৫

[১৯] ধ. শা. ইতি. প্রথম খণ্ড. পৃ- ২৭

বসিষ্ঠ ধর্মসূত্র: *বসিষ্ঠ ধর্মসূত্র*কে একটি স্বতন্ত্র রচনা রূপে আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু *বসিষ্ঠ শ্রৌতসূত্র* এবং *বসিষ্ঠ গৃহ্যসূত্র* পাওয়া যায় না। *বসিষ্ঠ ধর্মসূত্র* ৩০টি অধ্যায়ে বিভক্ত। জীবানন্দের *স্মৃতিসংগ্রহে* বিংশ অধ্যায় এবং একবিংশ অধ্যায়ে *বসিষ্ঠ ধর্মসূত্রের* কিছু অংশ পাওয়া যায়। এই একই বিষয় এম. এন. দত্তের সংগ্রহেও (কলকাতা ১৯০৮) পাওয়া যায়। কিন্তু আনন্দাশ্রম স্মৃতি সংগ্রহ (১৯০৫) এবং ফুহরর (১৯০৮) মহোদয়ের সংস্করণে ৩০টি অধ্যায় আছে।[২০] পি.ভি. কাণের মত অনুসারে এই ধর্মসূত্র প্রথম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে উপলব্ধ ছিল, এই জন্য এই ধর্মসূত্রের রচনাকাল খ্রি. পূ. ৩০০ - ১০০ খ্রি. পূ. এর মধ্যে বলে মনে করা হয়।[২১]

হারীত ধর্মসূত্র: *কৃষ্ণযজুর্বেদের* অন্তর্গত এই *হারীত ধর্মসূত্র*। ধর্মসূত্রকারদের মধ্যে অনেকেই *হারীত ধর্মসূত্রের* উল্লেখ করেছেন। এই ধর্মসূত্রে গদ্যের পাশাপাশি অনুষ্টুপ্ ও ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। হারীত ধর্মসূত্রে প্রায় সব বেদের উদাহরণ পাওয়া যায়। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে সব বেদের সঙ্গে এই ধর্মসূত্রের সম্পর্ক রয়েছে।

মানব ধর্মসূত্র: ম্যাক্সমূলর, বেবর, বূহলার প্রমুখ বিদ্বান ব্যক্তিগণ বর্তমান সমাজে পরিচিত ধর্মশাস্ত্রগুলি কুলধর্মগুলিকে আশ্রয় করে বৈদিক সূত্রবৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত। এই ধারণাকে ভিত্তি করেই অনেক পণ্ডিত *মনুস্মৃতি গ্রন্থ*কে *মানব ধর্মসূত্রের* আধার বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু একথা সত্য যে সংস্কৃত সাহিত্যে

---

[২০] ধ. শা. ইতি. প্রথম খণ্ড. পৃ - ২১

[২১] ধ. শা. ইতি. প্রথম খণ্ড. পৃ - ২৩

মানব ধর্মসূত্রের কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যূহলার *মানব ধর্মসূত্রের* সত্তাকে সিদ্ধ করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি *মনুস্মৃতি, বসিষ্ঠ ধর্মসূত্র, কামন্দকীয় নীতিসার* প্রমুখ গ্রন্থ থেকে নানা বিষয়ে *মানব ধর্মসূত্রের* সঙ্গে প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু উক্ত প্রমাণগুলির বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

ম্যাক্সমূলর, বেবর, ব্যূহলার প্রমুখ বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের মতে বর্তমান যুগের *মনুস্মৃতি* গ্রন্থের আকর বা মূল গ্রন্থ হল *মানব ধর্মসূত্র*। তাঁদের মতে *মনুস্মৃতি* হল *মানবধর্মসূত্রের* সংশোধিত ও পদ্যবদ্ধ সংস্করণ।[২২] এ সম্পর্কে ম্যাক্সমূলর বলেছেন[২৩]- 'এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, যে সকল আদর্শ ধর্মশাস্ত্র বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে সেগুলি প্রাচীনকালের ধর্মকে আশ্রয় করে লেখা। ধর্মসূত্রগুলি পূর্বে কোনও না কোনও বৈদিক শাখার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং এগুলি সেই শাখারই সংশোধিত রূপ।' কিন্তু পি. ভি. কাণের মতো ম্যাক্সমূলর-এর এই অনুমান ভ্রান্ত। ম্যাক্সমূলরের এই মতটিকে সমর্থন করেছিলেন ব্যূহলার *মানবধর্মসূত্রের* অস্তিত্ব রক্ষায় নানা বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে *মনুস্মৃতি* পদ্যবদ্ধ গ্রন্থ যা মানব ধর্মসূত্রেরই রূপান্তরিত রূপ। *বসিষ্ঠ ধর্মসূত্রে* মনুশাস্ত্র বিষয়ক অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এই ধর্মসূত্রে পাওয়া সকল তথ্য *মনুস্মৃতিগ্রন্থে* দেখা যায় না, এই সব কারণে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন তাহলে মনুসম্বন্ধিত যে বিষয়গুলি *মনুস্মৃতি*তে দেখা যায় না, তা *মানবধর্মসূত্রে* ছিল। কিন্তু একথা পি. ভি. কাণে-র মতে যুক্তিসম্মত নয়।

[২২] ঝধপৎবফ ইড়ড়শং ড়ভ ঃযব ঊধংঃ ঠড়ষ. ১৪, ঢ়- ২০

[২৩] ধ. শা. ইতি. প্রথম খণ্ড. পৃ- ২৭

কৃষ্ণযর্জুবেদের বিখ্যাত পণ্ডিত কুমারিল ভট্ট *মানব ধর্মসূত্রের* চর্চা করেননি। কুমারিল ভট্ট *মনুস্মৃতি* গ্রন্থকে গৌতম ধর্মসূত্রের থেকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে এই কুমারিল ভট্টের শিষ্য কৃষ্ণযজুর্বেদী পণ্ডিত বিশ্বরূপ কিছু কিছু মতকে শংকরাচার্যের শিষ্য সুরেশ্বরের বলে মানলেও মানব ধর্মসূত্রের বলে স্বীকার করেননি। নানা প্রমাণ বিবেচনা করে এ কথা বলা যায় *মানব ধর্মসূত্রের* কোনও অস্তিত্বই নেই। আবার মনুস্মৃতি ওই গ্রন্থের সংশোধিত সংস্করণও নয়।

বৈখানস ধর্মসূত্র: *বৈখানস ধর্মসূত্র কৃষ্ণযজুর্বেদের* অন্তর্গত। *বৈখানস ধর্মসূত্র* কালান্ড মহোদয় দ্বারা সম্পাদিত 'বৈখানস-স্মৃতিসূত্র'-এর অষ্টম, নবম এবং দশম প্রশ্ন।[২৪] আচার্যগণের মতানুসারে *বৈখানস ধর্মসূত্র* তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর রচনা।[২৫]

হিরণ্যকেশী ধর্মসূত্র: এটি হিরণ্যকেশী কল্পসাহিত্যের ২৬তম ও ২৭তম প্রশ্ন। সাধারণত এই ধর্মসূত্রকে একটি স্বতন্ত্র রচনা বলা যায় না, কারণ এখানে বহুবিধ সূত্র গ্রহণ করা হয়েছে *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র* থেকে। এই ধর্মসূত্রের উপর মহাদেব দীক্ষিতের *উজ্জ্বলা বৃত্তি* পাওয়া যায়।

২.৩- যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রের বিশেষত্ব

আপস্তম্ব ধর্মসূত্র:

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রগুলির মধ্যে অন্যতম হল *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র*। মূল *আপস্তম্বীয় কল্পসূত্রের* সমগ্র সংকলনে তিরিশটি প্রশ্ন আছে। তার মধ্যে আঠাশ এবং

---

[২৪] বৈ. সা. সং. পৃ- ৩৩৯

[২৫] বৈ. সা. সং. পৃ- ১৫১

ঊনত্রিশ সংখ্যক প্রশ্নদুটিই হল *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র*। এই দুই প্রশ্ন এগারোটি করে পটলে বিভক্ত এবং যথাক্রমে বত্রিশ ও ঊনত্রিশ কণ্ডিকায় বিন্যস্ত। প্রথম প্রশ্নে ধর্মের প্রমাণ, বর্ণধর্ম, ব্রহ্মচারীর নিয়ম ও দণ্ড, উপনয়নের নিয়ম ও কাল, ব্রহ্মচারীর নিয়ম ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্নে গৃহস্থের ধর্ম, অতিথিসৎকারবিধি, দণ্ডের নিয়ম, বানপ্রস্থের নিয়ম, রাজার কর্তব্য, বিবাহের প্রকারভেদ, গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।[২৬]

বৌধায়ন ধর্মসূত্র:

চারটি প্রশ্নে বিভক্ত এই ধর্মসূত্রে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার, জাতি-বর্ণবর্ণবিশেষে দণ্ড প্রভৃতির আলোচনা রয়েছে। প্রথম প্রশ্নের প্রথম অধ্যায়ে ধর্ম, আর্যাবর্তের বিভিন্ন রাজ্যের আচার, ব্রহ্মচর্য এবং উপনয়ন, অভিবাদনের নিয়ম; দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিষ্যের যোগ্যতা এবং ব্রহ্মচর্যের মহত্ত্ব; তৃতীয় অধ্যায়ে স্নাতকের কর্তব্য; চতুর্থ অধ্যায়ে কমণ্ডলুর মহত্ত্ব; পঞ্চম অধ্যায়ে আচমন এবং বস্ত্র ও পাত্রের শুদ্ধি, শুদ্ধ, অশৌচ এবং অস্পৃশ্যতা, ভক্ষ্যাভক্ষ্য; ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভূমি এবং পাত্রের শুদ্ধীকরণ; সপ্তম অধ্যায়ে যজ্ঞকর্মের নিয়ম; অষ্টম অধ্যায় ও নবম অধ্যায়ে বিবাহ ও পুত্রের প্রকার; দশম অধ্যায়ে করের অংশ, বর্ণধর্ম, বর্ণানুসারে মনুষ্যবধের দণ্ড, সাক্ষীর যোগ্যতা; একাদশ অধ্যায়ে বিবাহের ভেদ প্রভৃতি বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রথম অধ্যায়ে পাতক কর্মের প্রায়শ্চিত্ত, পতনীয় কর্ম কৃচ্ছ্রব্রতের ভেদ; দ্বিতীয় অধ্যায়ে সম্পত্তি এবং পুত্রের বিভাজন, স্ত্রীর ধর্ম ও স্ত্রীর পরতন্ত্রতা; তৃতীয় অধ্যায়ে স্নান, দান, ভোজনের নিয়ম, নিবাসযোগ্য স্থান এবং পূজ্য ব্যক্তি; চতুর্থ

---

[২৬] ধ. শা. ইতি. প্রথম খণ্ড. পৃ - ১৭

অধ্যায়ে সন্ধ্যোপাসনা, গায়ত্রী এবং প্রাণায়াম; পঞ্চম অধ্যায়ে শারীরিক শুদ্ধি এবং তর্পণ; ষষ্ঠ অধ্যায়ে গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসের কর্তব্যসমূহ; সপ্তম অধ্যায়ে আত্মজ্ঞান; অষ্টম অধ্যায়ে শ্রাদ্ধ ও দানের নিয়ম; নবম অধ্যায়ে সন্তান উৎপত্তির মহত্ত্ব; দশম অধ্যায়ে সন্ন্যাস এবং আত্মযজ্ঞ ইত্যাদির আলোচনা রয়েছে।

তৃতীয় প্রশ্নের প্রথম অধ্যায়ে পরিব্রাজকের ভেদ; দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছয় প্রকারের জীবনবৃত্তি; তৃতীয় অধ্যায়ে বানপ্রস্থের ভেদ; চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রতভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত; পঞ্চম অধ্যায় থেকে নবম অধ্যায়ে অঘমর্ষণ, যাবকব্রত, কুষ্মাণ্ডহোম, চান্দ্রায়ণ, দশম অধ্যায়ে প্রায়শ্চিত্তের নিয়ম প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ প্রশ্নের প্রথম অধ্যায়ে প্রায়শ্চিত্ত, কন্যাদানের কাল, ঋতুগমনের মহত্ত্ব, প্রাণায়াম; দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভ্রূণহত্যার প্রায়শ্চিত্ত, অবকীর্ণীর প্রায়শ্চিত্ত; তৃতীয় অধ্যায়ে রহস্যপ্রায়শ্চিত্ত; চতুর্থ অধ্যায়ে শাস্ত্রসম্প্রদায়; পঞ্চম অধ্যায়ে জপ তথা বিবিধ ব্রত; ষষ্ঠ অধ্যায়ে রহস্যপ্রায়শ্চিত্ত; সপ্তম অধ্যায়ে ধর্মপালনের প্রশংসা; অষ্টম অধ্যায়ে গণহোম ইত্যাদির বিবরণ সুবিন্যস্ত হয়েছে।[২৭]

বৈখানস ধর্মসূত্র:

*সত্যাষাঢ় শ্রৌতসূত্রের বৈজয়ন্তী টীকা*তে বৈখানসের উল্লেখ করা হয়েছে।[২৮] *গৌতম ধর্মসূত্রে* বাণপ্রস্থ বোঝানোর জন্যে বৈখানস শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে।[২৯]

---

[২৭] বৌ. ধ. সূ. প্রস্থা - পৃ - ২৬

[২৮] ধ. শা. ইতি. প্রথম খণ্ড. পৃ - ৩৪

[২৯] গৌ. ধ. সূ. ৩/২

বৌধায়ন ধর্মসূত্রেও বৈখানস শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩০] এই ধর্মসূত্রের টীকাকার হরদত্ত ও গোবিন্দস্বামী বৈখানসের অর্থ আশ্রম বলেছেন। পি ভি কাণে মহাশয় এই ধর্মসূত্রকে *বৈখানস* ধর্মপ্রশ্ন নামে অভিহিত করেছেন।[৩১] *বৈখানস ধর্মসূত্র বৈখানসস্মৃতিসূত্রের* (কালাণ্ড কর্তৃক সম্পাদিত) অষ্টম, নবম এবং দশম প্রশ্ন। এই ধর্মসূত্রে তিনটি প্রশ্ন পাওয়া যায়। প্রশ্নগুলিকে কয়েকটি খণ্ডে বিভাজন করা হয়। প্রথম প্রশ্নে এগারোটি, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রশ্নে পনেরোটি করে খণ্ড আছে। প্রথম প্রশ্নে চার বর্ণের এবং চার আশ্রমের অধিকার ও কর্তব্য এবং বিভিন্ন যজ্ঞের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্নে সন্ন্যাসীর কর্তব্য এবং সন্ধ্যা ও অভিবাদনের নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় প্রশ্নে গৃহস্থের আচার, ব্যবহার বিষয়ে আলোচনা করেছেন গ্রন্থকার।

বিষ্ণু ধর্মসূত্র: *বিষ্ণু ধর্মসূত্রের* একশোটি অধ্যায় হলেও আকারের দিক থেকে কিন্তু লঘু, কারণ এই ধর্মসূত্রের অনেক অধ্যায়ে দশটিরও কম সূত্র আছে।[৩২] আর পাঁচটি অধ্যায়ে কেবল দুটি করে সূত্র বা পদ্য আছে।[৩৩] অধ্যায় বিভাজনের ক্ষেত্রে বিষয়গত শ্রেণিবিন্যাসও এখানে করা হয়নি। তাই এই বিষয়ে রাম গোপাল মহাশয়ের অনুমান হল এই যে, অধ্যায়ের যে বিভাজনটি করা হয়েছে সেটি পরিকল্পনা অনুসারেই একশ

[৩০] বৌ. ধ. সূ. ৩/৩/৩/১৫

[৩১] ধ. শা. ইতি. প্রথম খণ্ড. পৃ - ৩৪

[৩২] বি. ধ. সূ. ১২, ১৩, ২৬, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৫৩, ৬৩, ৭২, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৮৪, ৮৮, ৮৯, ১০০

[৩৩] বি. ধ. সূ. ৩৪, ৩৬, ৪০, ৪২, ৭৬

সংখ্যা পৌঁছানোর জন্য করা হয়েছে।[৩৪] *বিষ্ণু ধর্মসূত্রের* আলোচ্য বিষয় হল- বর্ণাশ্রমধর্ম, রাজধর্ম, ব্যবহার, প্রায়শ্চিত্ত, দায়-বিভাগ, বারো প্রকারের পুত্র, যুগ ও মন্বন্তর, অশৌচ, শৌচ, বিবাহ, স্ত্রীধর্ম, শ্রাদ্ধ, দান ইত্যাদি।

শঙ্খলিখিত ধর্মসূত্র:

শৈলী ও বিষয়সূচীতে *শঙ্খলিখিত ধর্মসূত্র* অন্যান্য ধর্মসূত্রের সঙ্গে মিলে মিশে আছে। *গৌতম* ও *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে* যতগুলি নিয়ম আছে তার অধিকাংশই এই ধর্মসূত্রে পাওয়া যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গৌতম ও *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের* থেকে *শঙ্খলিখিত ধর্মসূত্র* তুলনামূলক প্রগতিশীল। নানা বিষয় বিস্তারে, যেমন বিষয় সম্পত্তির বিভাজনের ক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্মসূত্রের তুলনায় এই ধর্মসূত্র এগিয়ে। এই ধর্মসূত্রে পুরাণে বর্ণিত ভৌগোলিক অবস্থানের কথা আমরা জানতে পারি। *শঙ্খলিখিত ধর্মসূত্রের* পদ্যাংশে আমরা যম, কাত্যায়ন ও শংখের নাম পাই।[৩৫]

হারীত ধর্মসূত্র:

কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত এই *হারীত ধর্মসূত্র* সূত্রসাহিত্যে এক অনন্য স্থান অধিকার করে রয়েছে।[৩৬] এই ধর্মসূত্র সম্পূর্ণ রূপে পাওয়া যায় না। *হারীত ধর্মসূত্রের* উল্লেখ পাওয়া যায় কিছু কিছু ধর্মসূত্রে। সর্বপ্রথম *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* হারীতের নাম

---

[৩৪] ঞ্তযব হঁসনবৎ ড়ভ পযধঢ়ঃবৎং ংববসং ঃড় যধাব নববহ ঢ়ঁৎঢ়ড়ংবষু নৎড়ঁমযঃ ঃড় ঃযব ৎড়ঁহফ ভরমঁৎব ড়ভ ধ যঁহফৎবফ ঃড় পড়ৎৎবংঢ়ড়হফ রিঃয ঃযব হঁসনবৎ ড়ভ ঠরংযহঁং হধসবং বহঁসবৎধঃবফ রহ ঈযধঢ়ঃবৎ ঢঈঠওওও. ওহফরধ ড়ভ ।বফরপ শধষঢ়ধঁঃৎধং, ঢ়-৬১

[৩৫] ধ. শা. ইতি. প্রথম খণ্ড. পৃ - ২৭

[৩৬] আ. ধ. সূ. ভূমিকা, পৃ - ১৬

পাওয়া যায়।[৩৭] হারীতের মতের উল্লেখ *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের* কিছু কিছু স্থানে করা হয়েছে।[৩৮] *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের* উল্লিখিত হারীত-এর বিচার অধিকাংশ কঠোর নিয়মের পক্ষপাতী। *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র* ও *বৌধায়ন ধর্মসূত্র* দুই গ্রন্থই প্রায় হারীতের একই কথার উদাহরণ দিয়েছে। এই ধর্মসূত্রে গদ্যের পাশাপাশি অনুষ্টুপ্ ও ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। *হারীত ধর্মসূত্রে* প্রায় সব বেদের উদাহরণ পাওয়া যায়। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে সব বেদের সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে। এই ধর্মসূত্রে কাশ্মীরী শব্দ 'কফেল্লা'-র প্রয়োগ থাকার কারণে হারীতের কাশ্মীর-নিবাসী হবার সংকেত পাওয়া যায়।[৩৯]

হিরণ্যকেশী ধর্মসূত্র:

হিরণ্যকেশী কল্পসূত্রের ২৬তম ও ২৭তম প্রশ্ন *হিরণ্যকেশী ধর্মসূত্র*। সাধারণত এই ধর্মসূত্রকে একটি স্বতন্ত্র রচনা বলা যায় না, কারণ এখানে বহুবিধ সূত্র গ্রহণ করা হয়েছে *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র* থেকে।[৪০] এই ধর্মসূত্রের মহাদেব দীক্ষিতকৃত *উজ্জ্বলা বৃত্তি* পাওয়া যায়। *হিরণ্যকেশী ধর্মসূত্রের* নিজের কোনও ঐতিহাসিক গুরুত্ব না থাকলেও এটি *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের* প্রাচীনতার সত্যতা যাচাইয়ে গুরুত্বপূর্ণ।[৪১] ড.

[৩৭] বৌ. ধ. সূ. ২/১/২/১১

[৩৮] আ. ধ. সূ. ১/৪/১৩/১১, ১/৬/১৯/১২, ১/১০/২৯/১২, ১/১০/২৮/১, ১/১০/২৮/৫, ১/১০/২৮/১৬

[৩৯] ধ. শা. ইতি. প্রথম খন্ড - ১, পৃ - ৭১

[৪০] ধ. শা. ইতি. প্রথম খণ্ড. পৃ - ২১

[৪১] ওহফরধ ড়ভ ঠবফরপ কধষঢ়ধংΩৎধং, ঢ়-৫৮

বৃহলর মহাশয়ের মতানুসারে *হিরণ্যকেশী* ও *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র* একে অপরের পরিপূরক।[৪২]

[৪২] ঝ.ই.ঊ, াড়ষ - ২, ঢ়- ২৩

তৃতীয় অধ্যায়

যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রে রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার চিত্র

তৃতীয় অধ্যায়

যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রে রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার চিত্র

৩.১.১- ভৌগোলিক পরিবেশ

একটি দেশের সামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতি সেই দেশের ভৌগোলিক অবস্থার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। সুতরাং সমাজ-জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়ের উন্নতির পশ্চাতে ভৌগোলিক পরিবেশের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। সকল উপলব্ধ ধর্মসূত্রগুলি অধ্যয়ন করলে তৎকালীন ভৌগোলিক চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান বলতে সেই দেশের জলবায়ু - ঋতু, বিভিন্ন নদী, পর্বত বিভিন্ন স্থান ইত্যাদিকে বোঝায়। ধর্মসূত্রগুলিতে উল্লিখিত বিভিন্ন নদী, পর্বত ও বিভিন্ন স্থানের উল্লেখ তৎকালীন ভৌগোলিক অবস্থার পরিচয় বহন করে।

বৌধায়ন ধর্মসূত্রে প্রাপ্ত ভৌগোলিক নিদর্শন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের জন্য অত্যন্তই উপযোগী। *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* বর্ণাশ্রম সম্বন্ধীয় নিয়মের উল্লেখ আছে। সেই সঙ্গে তৎকালীন ভৌগোলিক অবস্থারও উল্লেখ আছে। এই ধর্মসূত্রে প্রাপ্ত ভৌগোলিক বর্ণনার সঙ্গে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার সম্বন্ধ জড়িত। মহর্ষি বৌধায়ন তাঁর ধর্মসূত্রে আর্যাবর্তের সীমার উল্লেখ করেছেন।[১] আর্যাবর্তের সীমা বিষয়ে তিনি সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, কালক বন ও হিমালয়ের উল্লেখ করেছেন।[২] এছাড়াও উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের সীমার উল্লেখ পাওয়া যায় *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে*।[৩] বৈদিকযুগে বহু

---

[১] বৌ. ধ. সূ. ১/১/২/১০

[২] বৌ. ধ. সূ. ১/১/২/১০-১৩

[৩] বৌ. ধ. সূ. ১/১/২/১

মানুষ গ্রামে বাস করতেন। ঋগ্বেদের সমকালীন সমাজব্যবস্থা অধ্যয়ন করলে লক্ষ্য করা যায়, সেই সময় দেশের সমূহ বিকাশ সাধন গ্রামেই হয়েছিল। সূত্রসাহিত্যে গ্রামীণ মানুষদের জীবন-ধারণের বহুবিধ জীবিকার উল্লেখ পাওয়া যায়।

৩.১.২- গৃহসংস্থান- আবাস

সুখে বসবাসের জন্য বাসস্থান নির্মাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাসস্থান নির্ধারণের জন্য ভূমি-নির্ধারণও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাসস্থান নির্মাণ বিষয়ক বিভিন্ন পদ্ধতি বাস্তুশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ তথা স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বাস্তুশাস্ত্রের পটভূমি নিহিত রয়েছে বৈদিক সাহিত্যে। *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র, বৌধায়ন ধর্মসূত্র, বিষ্ণু ধর্মসূত্র* ইত্যাদি গ্রন্থে গৃহনির্মাণের জন্য ভূমি তথা পরিবেশ নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণিত রয়েছে। মহর্ষি আপস্তম্বের মতে বহু জলাশয়ের নিকটবর্তী স্থান গৃহীর গৃহ নির্মাণের জন্য উপযুক্ত।[৪] সূত্রকার বৌধায়ন পর্যাপ্ত পরিমাণে যব, উদক, সমিধ, কুশ, মাল্য এবং যজন-যাজনের উপযুক্ত দ্রব্যসামগ্রী যেখানে উপলব্ধ হয় সেরূপ স্থানকেই গৃহ নির্মাণের জন্য উপযুক্ত বলে মত প্রদান করেছেন।[৫] *বিষ্ণু ধর্মসূত্রেও* আপস্তম্ব ও বৌধায়নের মতটিকেই পরোক্ষে উল্লেখ করা হয়েছে। বিষ্ণু ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে অধার্মিক জনগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত শূদ্ররাজ্য এবং বৈদ্যবিহীন স্থান বসবাসের জন্য অনুপযুক্ত।[৬]

---

[৪] প্রভূতৈধোদকে গ্রামে যত্রাঽঽত্মাধীনং প্রযমণং তত্র বাসো ধার্ম্যো ব্রাহ্মণস্য। আ. ধ. সূ. ১/৫/১৫/২২

[৫] বৌ. ধ. সূ. ২/৬/৩১

[৬] ন শূদ্ররাজ্যে নিবসেৎ। নাধার্মিকজনাকীর্ণে। ন সংবসেৎ বৈদ্যহীনে। নোপসৃষ্টে। বি. ধ. সূ. ৭১/৬৪ - ৬৭

শূদ্রবহুল রাজ্য অথবা যেখানে অধার্মিক ব্যক্তির সংখ্যা বেশি কিংবা যে স্থান পাষণ্ডী কিংবা অন্ত্যজ ব্যক্তিদের দ্বারা উপদ্রুত, সেই সব স্থান বসবাসের জন্য অনুপযুক্ত বলে মনু মনে করেন-

ন শূদ্ররাজ্যে নিবসেন্নাধার্মিকজনাবৃতে।

ন পাষণ্ডিগণাক্রান্তে নোপসৃষ্টেঽন্ত্যজৈর্নৃভিঃ।।[৭]

এছাড়াও পতিত, চণ্ডাল, পুক্কশ, মূর্খ, ধন-সম্পত্তির গর্বে মত্ত, অন্ত্যজ এবং অন্ত্যাবসায়ী ব্যক্তির দ্বারা জনবহুল কোনও স্থানও বসবাসের অনুপযুক্ত বলে মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে।[৮]

৩.১.৩- রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাজতন্ত্র

বৈদিক যুগে পরিবারই ছিল সমাজের মূল ভিত্তি এবং সমাজ ছিল রাজ্যের সুদৃঢ় ভিত্তি। রাজাই ছিলেন রাজ্যের কর্ণধার। ঋগ্বেদে রাজন্ বা রাজা শব্দের ব্যবহার দেখে অনেকে অনুমান করেন বৈদিক যুগে রাজতন্ত্রের প্রচলন ছিল। যদিও ঋগ্বেদে রাজন্ শব্দটি কোনও রাষ্ট্রের অধিপতিকে বোঝায়নি, বুঝিয়েছে জনগোষ্ঠীর প্রধান বা নেতাকে। বরুণ, ইন্দ্র, সোম প্রভৃতি দেবতাদের রাজারূপে বর্ণিত করা হয়েছে। রাজা ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে মন্ত্রীরূপে বরণ করতেন ও তাঁর পরামর্শে রাজ্য পরিচালনা করতেন। রাজাদের বহুবিবাহ প্রথাসিদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে মহিষী, বাবাতা, পরিবৃক্তা

---

[৭] মনু. ৪/৬১

[৮] ন সংবচ্ছে পতিতৈর্ন চাণ্ডালৈর্ন পুক্কশৈঃ।
ন মূর্খৈর্নাবলিপ্তৈশ্চ নান্ত্যৈর্নান্ত্যাবসায়িভিঃ।। মনু. ৪/৭৯

ও পালাগলী এই চার শ্রেণীর রানীর উল্লেখ আছে। তবে কেবলমাত্র মহিষী নাম্নী রানীর সাংবিধানিক মর্যাদা ছিল।

যুদ্ধবিগ্রহ রাজার প্রাথমিক কর্তব্য ছিল।[৯] রাজা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে যেতেন। জনগণের নিরাপত্তা বিধান করা রাজার কর্তব্য ছিল। তিনি জনগণের রক্ষক- 'গোপং করসে জনস্য'।[১০] প্রজাদের চূড়ান্ত আনুগত্য তাঁর প্রাপ্য ছিল। রাজা ছিলেন দণ্ডনীতির পরিচালক এবং স্বয়ং দণ্ডের বাইরে। *ঐতরেয় ব্রাহ্মণে* রাষ্ট্র শব্দের দ্বারা রাষ্টের রক্ষক হিসাবে পুরোহিতকে বোঝানো হয়েছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে রাষ্ট্র বোঝাতে রাজ্য শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে।[১১]

বৈদিক যুগে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটলেও রাজক্ষমতার উপর জনগণের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ ছিল। বৈদিক সাহিত্যগুলিতে চার বর্ণের জনগণের সংস্থার উল্লেখ মেলে- সভা, সমিতি, বিদথ ও পরিষদ্।

রাজা এবং রাজতন্ত্র

নিরুক্তকার রাজা শব্দের নির্বচন করতে গিয়ে বলেছেন- 'রাজা রাজতেঃ'। অর্থাৎ দীপ্ত্যর্থক রাজ্ ধাতু থেকে রাজা শব্দটি এসেছে যার অর্থ হল জাঁকজমকপূর্ণ।[১২] কিন্তু মহাভারতের শান্তিপর্বে বলা হয়েছে রাজা শব্দের উৎপত্তি 'রঞ্জ্' ধাতু থেকে যার

---

[৯] ক. সং ৯/১৭, ১০/৩, ৮২/২১, তৈ. সং. ৬/৪/৮/৩, শ. ব্রা. ২/৪/৬/২

[১০] ঋ. বে. ৩/৪৩/৫

[১১] তৈ. সং. ২/১/৩/৪, ঐ. ব্রা. ৭/২৩, শ. ব্রা. ৫/১/১/৩

[১২] নি. ২.৩

অর্থ হল প্রসন্ন করা। অর্থাৎ তিনিই হলেন রাজা যিনি প্রজাদের প্রসন্ন এবং সন্তুষ্ট রাখেন।[১৩]

প্রত্যেক ধর্মসূত্রে রাজার গুণের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজার কর্তব্যই হল প্রজাদের কল্যাণ বিধান করা। তিনি প্রজাদের সর্বপ্রকার সুখ ও শান্তিবিধানে সচেষ্ট থাকবেন। *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে রাজার লক্ষ্য থাকবে সেই সমস্ত বিষয়ের উপর, যা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। কোনও ব্যক্তি যাতে ক্ষুর্ধাত না থাকে, রোগভোগে আক্রান্ত হয়ে যন্ত্রণার শিকার না হয় কিংবা গ্রীষ্ম ও শীতে কষ্ট না পায় সেই দিকগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা রাজার কর্তব্য- 'ন চাস্য বিষয়ে রাষ্ট্রে ক্ষুধা রোগেণ হিমাতপাভ্যাং বাঽবসোদেদভাবাদ্ বুদ্ধিপূর্বং বা কশ্চিত্'।[১৪] *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে* গুরু ও অমাত্যকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে রাজার কখনই তাঁর গুরু ও মন্ত্রীর থেকে উত্তম জীবন যাপন করা উচিত নয়- 'গুরুনমাত্যাংশ্চ নাতিজীবেত্'।[১৫] এছাড়াও এই ধর্মসূত্রে প্রজাদের কল্যাণকামী রাজা কেমন হবেন সে বিষয়ে বলা হয়েছে, যে রাজার রাজ্য সকল প্রকার চোরের ভয় থেকে মুক্ত, যিনি সর্বদা প্রজাদের কল্যাণ বিধানে সচেষ্ট, সেই রাজাই ক্ষেমকৃদ বা কল্যাণকামী রাজা- 'ক্ষেমকৃদ্রাজা যস্য বিষয়ে গ্রাম্যেঽরণ্যে বা তস্করভয়ং ন বিদ্যতে'।[১৬] *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* রাজার কর্তব্য বিষয়ে বলা হয়েছে যে, রাজা সর্বদা প্রজাদের রক্ষায় সচেষ্ট থাকবেন।

[১৩] মহা. শা. প. ৫৯/১২৫

[১৪] আ. ধ. সূ. ২/১০/২৫/১১

[১৫] আ. ধ. স.- ২/১০/২৫/১০

[১৬] আ. ধ. সূ. ২/১০/২৫/১৫

তিনি কখনও যুদ্ধ বিমুখ হবেন না - 'সংগ্রামে ন নিবর্তেত'।[১৭] এই ধর্মসূত্রে যুদ্ধের নানা নিয়মও বর্ণিত রয়েছে, যেমন- রাজা যুদ্ধে কখনই অত্যধিক তীক্ষ্ণ, শূল ও বিষলিপ্ত অস্ত্রের প্রয়োগ করবেন না- 'ন কর্ণিভির্ন দিগ্ধৈঃ প্রহরেত্'।[১৮] ভয়ে ভীত, সুরাপানে মত্ত, পাগল, চেতনাহীন, স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ এবং ব্রাহ্মণের সঙ্গে কখনও যুদ্ধ করবেন না, কিন্তু শত্রুর উপর আক্রমণ করবেন- 'ভীতমত্তোন্মত্তপ্রমত্তবিসন্নাহস্ত্রীবাল-বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণৈর্ন যুধ্যেতাঽন্যত্রাঽঽততাযিনঃ'।[১৯] *বিষ্ণু ধর্মসূত্রে* রাজার কূটনীতি বিষয়ে বলা হয়েছে- শত্রু, মিত্র ও উদাসীন ও মধ্যম রাজা সাম, ভেদ, দান, দণ্ড এই চারটি উপায় ব্যবহার করবেন। সময় অনুযায়ী সন্ধি, বিগ্রহ, দান, আসন, সংশ্রয় ও দ্বৈধীভাব ব্যবহার করবেন। তিনি চৈত্র অথবা মাঘ মাসে শত্রুরাজাকে আক্রমণ করবেন অথবা শত্রু যখন দুর্বল হয়ে পড়বেন তখন আক্রমণ করবেন।[২০] যদি কোনও শত্রু আক্রমণ করেন তাহলে সর্বপ্রকার নীতি প্রয়োগ করে সেই রাজার বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ ঘোষণা করা রাজার কর্তব্য। এই ধর্মসূত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া বলা হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে রাজার শরীর ত্যাগের সমান অন্য কোনও ধর্ম নেই। গরু, ব্রাহ্মণ, মিত্র, ধন এবং

---

[১৭] বৌ. ধ. সূ. ১/১০/১৮/৯

[১৮] বৌ. ধ. সূ. ১/১০/১৮/১০

[১৯] বৌ. ধ. সূ. ১/১০/১৮/১১

[২০] শত্রুমিত্রোদাসীনমধ্যমেষু সামভেদদানদণ্ডান্যথার্হ যথাকালং প্রযুজ্জীত। সন্ধিবিগ্রহযানাসনসংশ্রযদ্বৈধীভাবাংশ্চ যথাকালমাশ্রযেত্। চৈত্রে মার্গশীর্ষে বা যাত্রাং যাযাত্। পরস্য ব্যসনে বা। বি. ধ. সূ. ৩/৩৮-৪১

পত্নী রক্ষা করতে গিয়ে যদি কোনও ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে তিনি স্বর্গ প্রাপ্ত হন।[২১]

গৌতম ধর্মসূত্রকারের মতে রাজার আচরণ হওয়া উচিত- 'সাধুপারী সাধুবাদী'।[২২] তিনি ত্রিবিদ্যা ও ন্যায়বিদ্যায় পারদর্শী হবেন- 'এয্যামান্বীক্ষিক্যাং বাঽভিবিনীতঃ'।[২৩] এছাড়াও রাজা হবেন জিতেন্দ্রিয়, গুণীজনের সমাদরপ্রিয় এবং সাম, দান প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ- 'শুচির্জিতেন্দ্রিয়ো গুণবতমহাযোপাযসম্পন্নঃ'।[২৪]

মনুসংহিতায় রাজার সৃষ্টির কারণ বর্ণিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে রাজার কারণেই পৃথিবী সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। এই জগতে প্রজাদের নিয়ামক অর্থাৎ রাজা না থাকলে সকল ভয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠত, এই কারণে এই পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য পরমেশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করেছেন।[২৫] সেই রাজার অলৌকিক প্রভাব থাকার হেতু তাঁকে অগ্নি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ আর ইন্দ্রস্বরূপ বলা হয়েছে।[২৬]

---

[২১] পরেণাভিযুক্তশ্চ সর্বাত্মনা স্বং রাষ্ট্রং গোপাযেত্। নাস্তি রাজাং সমরে তনুত্যাগসদৃশো ধর্মঃ।
গোব্রাহ্মণনৃপমিত্রধনদারজীবিতরক্ষণার্থে হতাস্তে স্বর্গলোকভাজঃ। বি. ধ. সূ. ৩/৪৩ - ৪৫

[২২] গৌ. ধ. সূ. ২/২/২

[২৩] গৌ. ধ. সূ. ২/২/৩

[২৪] গৌ. ধ. সূ. ২/২/৪

[২৫] অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ।। মনু. ৭/৩

[২৬] সোঽগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ স ধর্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ।। মনু. ৭/৭

পুরোহিতের ভূমিকা

বর্তমানে ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত কথা দুটি সমর্থক হলেও বৈদিক যুগে পদ দুটি আলাদা আলাদা অর্থে প্রযুক্ত হত। ঋগ্বেদের *অগ্নিসূক্তে*[২৭] অগ্নিকে দেবতাদের পুরোহিত বলা হয়েছে। সায়ণাচার্যের মতে অগ্নি যজ্ঞের পূর্বভাগে আহবনীয় অগ্নিরূপে অবস্থান করেন, তাই তিনি যজ্ঞের পুরোহিত। এছাড়া ব্যাখ্যাকার সায়ণাচার্য পুরোহিত শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন- পুরোহিত যেমন পূজা অর্চনার দ্বারা দেবতাদের তুষ্ট করে রাজার অভীষ্ট সিদ্ধ করেন, তেমনি অগ্নিদেবতাও যজ্ঞকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেন। সায়ণাচার্যের এই ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায়- রাজার শাসনকার্যে পুরোহিতের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুরোহিত একপ্রকার মূর্তিমান সংবিধানের রূপ ছিল। ধার্মিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং আর্থিক বিবাদের বিষয়ে পুরোহিতদের বিধানই পরম বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বলে গণ্য হত। রাজা সকল প্রকারের বিবাদে পুরোহিতের মতামত গ্রহণ করতেন। তিনি প্রজাদের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে পুরোহিতদের উপদেশ মেনে চলতেন। এ থেকে বোঝা যায়, রাজার শাসনব্যবস্থায় পুরোহিতের স্থান ছিল রাজার পরেই। বিভিন্ন ব্রাহ্মণগ্রন্থ এবং শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্য সূত্রেও পুরোহিতের উল্লেখ পাই। *শথপথ ব্রাহ্মণে*[২৮] পুরোহিতেরা জাগতিক দেবতারূপে গণ্য হয়েছিলেন। রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রে পুরোহিতেরা প্রায় প্রথম সারিতে অবস্থান করতেন। *তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ*[২৯] অনুসারে রাজা ইন্দ্র ও বরুণের প্রতিরূপ এবং পুরোহিত

---

[২৭] অ. সূ. ১/১

[২৮] শ. ব্রা. ২/২/২/৬

[২৯] তৈ. ব্রা. ২/৭/১

বৃহস্পতির প্রতিরূপ। *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*[৩০] অনুসারে পুরোহিতের মধ্যস্থতায় দেবতাগণ রাজ্যরক্ষা করতেন। বিভিন্ন সূত্রসাহিত্যে রাজাকে উপদেশ প্রদানের জন্য পুরোহিত নিয়োগ করতেন রাজা। এখানে Ram Gopal এর মন্তব্য- Every king had a Purohita (domestic Priest) who assisted and advised him in religious and political matters. Most of the Dharmasūtras enjoin upon the king to appoint a Purohita.[৩১] ধর্মসূত্রগুলিতেও রাজ্য ব্যবস্থায় পুরোহিতদের প্রাধান্য চোখে পড়ে। *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে* বলা হয়, রাজা এমন ব্যক্তিকে পুরোহিত পদে নিযুক্ত করবেন যিনি ধর্মবেত্তা।[৩২] *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে, রাজা সকল প্রকার জ্ঞান পুরোহিতের নিকট গ্রহণ করবেন আর তাঁর আদেশ অনুসারে রাজ্য পরিচালনা করবেন।[৩৩]

গৌতম ধর্মসূত্রে পুরোহিত নির্বাচন বিষয়ে বলা হয়েছে, রাজা সকল প্রকার বিদ্যাসম্পন্ন, শ্রেষ্ঠকুল থেকে উৎপন্ন, সুন্দর বাণী যাঁর এরূপ ব্যক্তি, রূপবান, চরিত্রবান, লোকের সঙ্গে ভালো আচরণকারী এবং ভোগ প্রভৃতি থেকে বিমুখ থাকা ব্রাহ্মণকে পুরোহিত নিয়োগ করবেন।[৩৪] *যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে* পুরোহিত বিষয়ে বলা হয়েছে, যিনি জ্যোতিষ বিদ্যা জানেন, অন্যান্য সব শাস্ত্রে পারদর্শী ও জ্ঞানী এবং

---

[৩০] ঐ. ব্রা. ৮/২৬

[৩১] I. v. k. p - 177

[৩২] রাজা পুরোহিতং ধর্মার্থকুশলম্। আ. ধ. সূ. ২/৫/১০/১৫

[৩৩] সর্বতোধুরং পুরোহিতং বৃণুযাত্। তস্য শাসনে বর্তেত। বৌ. ধ. সূ. ১/১০/১৮/৭-৮

[৩৪] ব্রাহ্মণং চ পুরোদধীত বিদ্যাভিজনবাগ্রূপবয়ঃ শীলসম্পন্নং ন্যাযবৃত্তং তপস্বিনম্। গৌ. ধ. সূ. ২/২/১২

দণ্ডনীতি ও অর্থনীতিতে কুশল এবং শান্ত- এরূপ ব্রাহ্মণকে নিজের পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত করা উচিত।[৩৫]

কর

বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় রাজা ছিলেন সমাজের কর্ণধার। রাষ্ট্রের জনগণের সুরক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল তাঁর। একই সঙ্গে রাজা গৃহস্থাশ্রমীও বটে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য হল এই যে তাঁর বৃত্তি প্রজাপালন। সাধারণ মানুষ যেখানে তাঁদের নিজ নিজ ক্ষুদ্র পরিবার প্রতিপালন করেন, রাজা সেখানে রাষ্ট্ররূপ বৃহত্তর পরিবারের দায়িত্ব পালন করেন। দেশের বহিরাগত শক্তির আক্রমণ থেকে রক্ষার স্বার্থে, দেশের প্রজাবর্গের সার্বিক উন্নতি ও মঙ্গল বিধানার্থে এবং রাজার ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের জন্য রাষ্ট্রের কিছু আয়ের উৎস থাকা একান্ত কাম্য। কর শুল্ক প্রভৃতি মূলতঃ সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করে থাকে। প্রজাদের পালনের জন্য, তাঁদের অভাব-অভিযোগ দূর করার জন্য এবং রাষ্ট্রে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সেই প্রজাদের আয় থেকেই শাস্ত্রবিহিত কর-শুল্কাদি গ্রহণ করে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। আধুনিক বিশ্বের মতো প্রাচীন ভারতেও রাষ্ট্রীয় আয়ের অন্যতম উৎস ছিল করব্যবস্থা। প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাষ্ট্রের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যই রাজাকে কর সংগ্রহের উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। যথাযথ রাজধর্ম পালনের মাধ্যমে রাজা প্রজাদের সুরক্ষা বিধান করতেন। এর ফলে প্রজারা স্ব স্ব বৃত্তিতে নিযুক্ত হয়ে জীবনধারণ করতে পারতেন এবং উপার্জিত অর্থের ভাগ কর বা শুল্ক হিসেবে রাজাকে দিতেন।

---

[৩৫] পুরোহিতং প্রকুর্বীত দৈবজ্ঞমুদিতোদিতম্।
দন্ডনীত্যাং চ কুশলমথর্বাঙ্গিরসে তথা।। যজ্ঞ. ১/৩১৩

প্রজাবর্গের রক্ষার উদ্দেশ্যেই রাজার সৃষ্টি, আবার প্রজাপালন করার জন্যই রাজাকে করগ্রহণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কর হল যেন রাজার রক্ষণরূপ কাজের পারিশ্রমিক। বস্তুত কর-শুল্কাদি ব্যতিরেকে রাজার অন্য কোনও ধর্মসম্মত জীবিকাও ছিল না। *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে* কর বিষয়ে বলা হয়েছে যে, বিদ্বান ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ ব্যক্তির কর থেকে মুক্ত হওয়া উচিত।[৩৬] এছাড়াও বলা হয়েছে শূদ্র জাতি সকল বর্ণের সেবা করে জীবিকা নির্বাহ করেন, তাই তাঁদের কাছ থেকে কর গ্রহণ না করার উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৭] এই ধর্মসূত্রে আরও বলা হয়েছে- 'অন্ধমূকবধিররোগাবিষ্টাশ্চ'। অর্থাৎ অন্ধ, মূক, বধির এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তিও যাতে কর থেকে মুক্ত থাকেন সেই বিধানও দেওয়া হয়েছে।[৩৮] *বিষ্ণু ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ কখনওই কর দান করবেন না। তিনি রাজাকে ধর্ম প্রদান করেন। রাজা প্রজাদের ভালো কর্ম এবং দুষ্কর্মের ফলের ছয় ভাগের এক ভাগ ভোগ করবেন।[৩৯]

গৌতম ধর্মসূত্রে কর বিষয়ে বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণ ব্যক্তিও কর প্রদান থেকে মুক্ত।[৪০] শারীরিক পরিশ্রমকারী ব্যক্তি, নৌকা বা গাড়ি চালিয়ে যিনি জীবিকা নির্বাহ করেন, সেই ব্যক্তি প্রত্যেক মাসে একদিন রাজার জন্য নিজে কর্ম করবেন, এটাই হল তাঁর কর। ওই দিন রাজা তাঁদের ভোজন করাবেন।[৪১]

---

৩৬ অকরঃ শ্রোত্রিয়। আ. ধ. সূ. ২/১০/২৬/১০

৩৭ শূদ্রশ্চ পাদাবনেক্তা। আ. ধ. সূ. ২/১০/১৬/১৫

৩৮ আ. ধ. সূ. ২/১০/১৬/১৬

৩৯ ব্রহ্মণেভ্যঃ করদানং ন কুর্যাত্। তে হি রাজ্ঞো ধর্মকরদাঃ। রাজা চ প্রজাভ্যঃ সুকৃতদুষ্কৃতষষ্ঠাংশযাক্। বি. ধ. সূ. ৩/২৬-২৮

৪০ অকরাংশ্চ। গৌ. ধ. সূ. ২/১/১১

৪১ এতেনাঽঽন্তোপজীবিতো ব্যাখ্যাতাঃ। নৌচক্রীবন্তশ্চ। ভক্তং তেভ্যো দদ্যাত্। গৌ. ধ. সূ. ২/১/৩২-৩৪

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে রাজা ধনাভাবে মরণাপন্ন হলেও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের কাছ থেকে কখনও যেন কর গ্রহণ না করেন।[৪২] এছাড়া অন্ধ, জড়, পঙ্গু এবং সত্তর বৎসরের অধিক বয়সী ব্যক্তিদের থেকেও রাজা কোনও কর গ্রহণ করবেন না।[৪৩]

দণ্ডদান

সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গেলে রাজার অপরাধীকে দণ্ডদান করা একান্ত কাম্য। দণ্ডের ভয়ে সমাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণের কোনও প্রকার অপরাধের জন্য বধের দণ্ডবিধান দেওয়া যাবে না।[৪৪] *বিষ্ণু ধর্মসূত্রে* রাজাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি অপরাধীর অপরাধ অনুসারে দণ্ড দেবেন আর দণ্ডের ন্যায়বিধি অনুসারে সম্যকরূপে দণ্ড নির্ধারণ করবেন- 'অপরাধানুরূপং চ দন্ডং দণ্ড্যেষু দাপযেত্। সম্যগ্ দন্ডপ্রণযনং কুর্যাত্'।[৪৫] *গৌতম ধর্মসূত্রে* দণ্ড বিষয়ে বলা হয়েছে, দমন করার কারণে দণ্ডবিধিকে দণ্ড বলা হয়েছে।[৪৬]

মনুর মত অনুসারে দণ্ডই সমস্ত প্রজাগণকে শাসন করে, দণ্ডই সবলের কবল থেকে সকল দুর্বলকে রক্ষা করে; সকলে নিদ্রিত থাকলেও একমাত্র দণ্ডই জাগ্রত থাকে। পণ্ডিতেরা দণ্ডকেই ধর্ম বলে নির্দেশ করেছেন -

দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি।

---

[৪২] মনু. ৭/১৩৩

[৪৩] অন্ধো জড়ঃ পীঠসর্পী সপ্তত্যা স্থবিরশ্চ যঃ।
শ্রোত্রিয়েষূপকুর্বংশ্চ ন দাপ্যাঃ কেনচিৎ করম্।। মনু. ৮/৩৯৪

[৪৪] অবধ্যো ব্রহ্মণস্সর্বাপরাধেষু। বৌ. ধ. সূ. ১/১০/১৯/১৭

[৪৫] বি. ধ. সূ. ৩/৯১-৯২

[৪৬] দণ্ডোদমনাদিত্যাহুস্তেনাদান্তান্দমযেত্। গৌ. ধ. সূ. ২/২/২৮

দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্তি দণ্ডং ধর্মং বিদুর্বুধা।।[৪৭]

যাজ্ঞবল্কের মত অনুসারে রাজ্যের শাসনভার প্রাপ্তির পরে রাজা অপরাধীদের দণ্ড প্রদান করেন, কেননা প্রাচীনকালে ব্রহ্মা দণ্ডের রূপে ধর্মের রচনা করেছিলেন।[৪৮]

৩.২ সমাজ

সংহিতার যুগ অপেক্ষা সূত্রসাহিত্যের যুগে সমাজ একটু জটিলতর রূপ ধারণ করে। এই সময় বর্ণাশ্রমব্যবস্থা ও জাতিপ্রথা আরও কঠোরভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করে। এছাড়া এই সময় সমাজে নানা ধরনের মানুষের ও নানা জীবিকার উদ্ভব ঘটে। ধর্মসূত্রগুলিতে নানা সংকর জাতির উল্লেখ মেলে।

৩.২.১- বর্ণব্যবস্থা ও জাতিপ্রথা

বর্ণ শব্দ 'বৃঙ্' বরণে ঘঞ্ প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়।[৪৯] এর অর্থ হল বরণ করা বা সূচনা করা। যাস্ক তাঁর *নিরুক্ত* গ্রন্থে 'বর্ণ' শব্দের নির্বচনে বলেছেন- 'বর্ণো বৃণোতেঃ'[৫০] বর্ণ হল সেটাই যাকে গুণ কর্ম অনুসারে বরণ করা হয়।

ধর্মসূত্র অনুসারে সমকালীন সমাজচিত্রের নানাবিধ চালচিত্রকে খুঁজে পাওয়া যায়। বিশেষত সমকালে চতুর্বর্ণের স্বতন্ত্র কর্ম সম্পাদনের রীতিনীতির প্রকট রূপ সহজেই লক্ষণীয়। ভারতীয় সাহিত্যে বর্ণব্যবস্থার প্রথম সংকেত *ঋগ্বেদে* পাওয়া

---

[৪৭] মনু. ৭/১৮

[৪৮] তদবাপ্য নৃপো দণ্ডং দুর্বৃত্তেষু নিপাতযেত্।
ধর্মো হি দণ্ডরুপেন ব্রহ্মণা নির্মিত পুরা।। যজ্ঞ. ১/৩৫৪

[৪৯] নিরুক্ত ২/৭, ২/৪

[৫০] নিরুক্ত ২/১/৪

যায়।[৫১] অমরকোশকারও এই চারবর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।[৫২] *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র* ও অন্যান্য ধর্মসূত্রগুলিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণের উল্লেখ মেলে।[৫৩] মনু তাঁর *মনুসংহিতা* গ্রন্থে বলেছেন- লোকসকলের কল্যাণের জন্য পরমেশ্বর নিজের মুখ, বাহু, উরু ও পা থেকে ক্রমবদ্ধ রূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র- এই চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছেন।

'লোকানাং তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।

ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রং চ নিরবর্তযত্'।।[৫৪]

ব্রাহ্মণ

প্রাচীনকাল থেকেই ব্রাহ্মণবর্ণ সমাজে অধিক সম্মান ও শ্রদ্ধালাভের অধিকারী ছিলেন। ব্রাহ্মণের বিষয়ে *ঋগ্বেদ,*[৫৫] *যজুর্বেদ,*[৫৬] *অথর্ববেদে*[৫৭] উল্লেখ আছে যে, ব্রাহ্মণই বিরাট্ পুরুষের মুখ। ধর্মসূত্রগুলিতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে* ব্রাহ্মণ বর্ণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণ হল সমাজের সবার থেকে

---

[৫১] ঋগ্বেদ

[৫২] অমরকোশ ২/৭২

[৫৩] 'চত্বারো বর্ণা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ'। আ. ধ. সূ. ১/১/১/৪

'চত্বারো বর্ণা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিট্ শূদ্রাঃ'। বৌ. ধ. সূ. ১/৮/১৫/১

'ব্রহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চেতি বর্ণাশ্চত্বারঃ'। বি. ধ. সূ. ২/১

'চত্বারো বর্ণা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ'। হি. ধ. সূ. ২৬/১/৪

'সামযাচারিকেশ্বভিবিনিতঃ'। গৌ. ধ. সূ. ১/৮/১১

[৫৪] মনু. ১/৩১

[৫৫] ঋগ্বেদ ১০/৯০/১২

[৫৬] যজুর্বেদ ৩১/১০

[৫৭] অথর্ববেদ ১৯/৬/৬

সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ। একরকম সাধারণীকরণ করলে বিষয়টি এমন দাঁড়ায় যে ব্রাহ্মণদের জীবন এবং অবস্থান সামগ্রিকভাবে বেদকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। এই ব্রাহ্মণের ধর্মসম্মত কর্ম হল- বেদকে রক্ষা করার জন্য অধ্যয়ন করা, বেদের অধ্যাপনা করা, নিজে যজ্ঞ করা এবং অপরকে যজ্ঞ করতে সাহায্য করা। তাঁদেরকে যেমন দান দিতে হবে, তেমনি তাঁরা দান গ্রহণও করবেন। তাই *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রকে* অবলম্বন করেই আমাদের বলতে হয়- 'স্বকর্ম ব্রাহ্মণস্যাঽধ্যযনমধ্যাপনং যজ্ঞো যাজনং দানং প্রতিগ্রহণং দাযাদ্যং সিলোঞ্ছঃ'।[৫৮] অন্যদিকে বিকল্প শ্লোকের উল্লেখে আংশিক সাযুজ্য খুঁজে পেলেও, আভ্যন্তরীণ অর্থের বিন্যাসে বক্তব্যের সমজাতীয় উপস্থাপনই আমরা খুঁজে পাই। যেমন- *বৌধায়ন ধর্মসূত্র* অনুসারে ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মার মহিমা বলা হয়েছে। পূর্বে আলোচিত *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের* মতোই এখানেও বেদকেন্দ্রিক কর্ম সম্পাদনের কথা বলা হয়েছে। যে ছয়টি কর্ম সম্পাদনের কথা এই সূত্রে বিবেচনা করা হয়েছে সেগুলি হল- বেদের রক্ষার জন্য অধ্যয়ন, বেদের অধ্যাপনা, নিজে যজ্ঞ করা, অপরকে যজ্ঞ করাতে সাহায্য করা, দান ও দানগ্রহণ। মূল উৎসের উদ্ধৃতি এরূপ - 'ব্রহ্মা বৈ স্বং মহিমনাং ব্রাহ্মণেষ্বদধাদ্ধ্যয়নাধ্যাপনযজন-যাজন-দানপ্রতিগ্রহসংযুক্তং বেদানাং গুপ্ত্যৈ'।[৫৯] *বিষ্ণু ধর্মসূত্রে* ব্রাহ্মণের মহত্ত্বের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে- 'দেবাঃ পরোক্ষদেবাঃ প্রত্যক্ষদেবাঃ ব্রহ্মণঃ'।[৬০] অর্থাৎ দেবতা পরোক্ষে দেবতা হলে, ব্রাহ্মণ কিন্তু প্রত্যক্ষ দেবতা রূপেই চিহ্নিত হবেন। *হিরণ্যকেশী ধর্মসূত্রেও* প্রায় সমজাতীয় বর্ণনা পাওয়া যায়। *গৌতম ধর্মসূত্রেও*

---

[৫৮] আ. ধ. সূ. ২/৫/১০/৫

[৫৯] বৌ. ধ. সূ. ১/১০/১৮/২

[৬০] বি. ধ. সূ. ১৯/২০

দ্বিজাতির ছয়টি কর্মের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে অধ্যয়ন, যজন ও দান অনিবার্য কর্তব্য। এর পাশাপাশি একই সঙ্গে অধ্যাপনা করতে হবে, যজ্ঞ করতে হবে, এমনকী দান গ্রহণ করাও ব্রাহ্মণের বৃত্তির জন্য নির্ধারিত কর্ম। 'দ্বিজাতীনামধ্যয়নমিজ্যা দানম্'। 'ব্রাহ্মণস্যাধিকাঃ প্রবচনযাজনপ্রতিগ্রহাঃ'।[৬১] মনু ব্রাহ্মণের কর্ম সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে, ব্রাহ্মণের ছয়টি কর্মের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল - অধ্যাপনা, স্বয়ং অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ। উল্লিখিত ছয়টি কাজ ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দ্দিষ্ট করে দেন-

'অধ্যাপনমধ্যযনং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ'।।[৬২]

*যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি*তেও ছয়টি কর্মের কথা বর্ণিত রয়েছে। তবে সেখানে আমরা এও খুঁজে পাই- যজ্ঞ করা, বেদাধ্যয়ন করা এবং দান করা এই তিনটি কর্ম ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের জন্য; কিন্তু ব্রাহ্মণদের জন্য দান করা, যজ্ঞ করা এবং অধ্যাপনা করাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্ম।[৬৩]

ক্ষত্রিয়

ব্রাহ্মণ বর্ণের পরেই ক্ষত্রিয় বর্ণের স্থান, তাই ব্রাহ্মণ বর্ণের পর দ্বিতীয় বর্ণ হিসেবে ক্ষত্রিয় বর্ণকে জন্ম থেকে ধরা হয়। *বিষ্ণু ধর্মসূত্রের* মত অনুসারে শস্ত্র ধারণ করা ক্ষত্রিয়ের নিত্য কর্ম, কেননা এই কর্ম করেই ক্ষত্রিয়েরা লোকেদের রক্ষা করে

---

[৬১] গৌ. ধ. সূ. ২/১/১-২

[৬২] মনু. ১/৮৮

[৬৩] ইজ্যাধ্যযনদানানি বৈশ্যস্য ক্ষত্রিযস্য চ।
প্রতিগ্রহোঽধিকো বিপ্র যাজনাধ্যাযনে যথা।। যাজ্ঞ. ১/১১৮

থাকেন এবং জীবিকা নির্বাহ করেন।[৬৪] এও উল্লেখ রয়েছে যে, যদি কোন ক্ষত্রিয়ের ধনপ্রাপ্তি ঘটে, তাহলে সেই ধনের চতুর্থাংশ তিনি রাজাকে দান করবেন। অপর চতুর্থ অংশের মধ্যে ব্রাহ্মণকে অর্ধেক দান করবেন।[৬৫] ক্ষত্রিয়কে যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং দান ছাড়াও অতিরিক্ত প্রাণীর রক্ষাকার্যও সম্পাদন করতে হয়। এই প্রাণ রক্ষা একটি বিশিষ্ট কর্ম রূপে বিহিত হয়।

ধর্মসূত্রকার গৌতম ক্ষত্রিয়ের ধর্ম এবং কর্তব্যের বিষয়ে বলেছেন যে, অধ্যয়ন করা, যজ্ঞ করা এবং দান করা- এগুলিই মূলত ক্ষত্রিয়ের সামান্য কর্তব্য- 'ব্রাহ্মণস্যাধিকাঃ প্রবচনযাজনপ্রতিগ্রহাঃ'।[৬৬]

মনুসংহিতা অনুসারে বলা হয়েছে প্রজারক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, নৃত্য গীত ও বনিতাদি বিষয়ভোগে অনাসক্তি- এই কয়েকটি কাজ ব্রহ্মা স্বয়ং ক্ষত্রিয়গণের জন্য সংক্ষেপে নির্দিষ্ট করেছেন-

'প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যায়নমেব চ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ'।।[৬৭]

বৈশ্য

এরপর আমরা বৈশ্যের উল্লেখ পাই। বৈশ্যের অবস্থান তৃতীয় স্থানে অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বর্ণের পরবর্তী পর্বেই বৈশ্যদের রাখা হয়েছে। শুধু যুদ্ধ আর দণ্ডই বৈশ্যের কাজ নয়। এর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কৃষিকাজ এবং পশুপালন করাও প্রধানতম কর্ম

---

[৬৪] ক্ষত্রিয়স্য ক্ষিতিচারম্। বি. ধ. সূ. ২/১২

[৬৫] ক্ষত্রিয়শ্চতুর্থমংশং রাজ্ঞেঽপরং চতুর্থমংশং ব্রাহ্মাণেভ্যোঽর্থমাদদ্যাত্। বি. ধ. সূ. ৩/৫৮

[৬৬] গৌ. ধ. সূ. ২/১/১

[৬৭] মনু. ১/৮৯

এবং কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হয়। সেই দিক থেকে কৃষিনির্ভর যাপন প্রণালীর মূল সুরটিকে অটুট রাখেন মূলত বৈশ্যরাই। *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের* প্রসঙ্গ টেনে তাই বলতে হয়- 'ক্ষত্রিয়বদ্বৈশ্যস্য দণ্ডযুদ্ধবর্জং কৃষিগোরক্ষ্যবণিজ্যাঽধিকম্'।[৬৮] এক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপরেও যে স্বতন্ত্র গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা গাঢ় সুরে বলবার অবকাশ রাখে। *বৌধায়ন ধর্মসূত্রেও* আমরা বৈশ্যের কর্তব্য প্রণালী বিষয়ে প্রায় সমজাতীয় বক্তব্যকেই খুঁজে পাই। ব্রাহ্মণদের যজ্ঞকর্ম বৃদ্ধি করবার জন্য বৈশ্যদের কিছু নির্দিষ্ট কর্ম প্রণালীর উপস্থাপন করা হয়েছে।

গৌতম ধর্মসূত্রে সূত্রকার বৈশ্যের কর্মের বিবেচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে- যজ্ঞ করা, অধ্যয়ন আর দান করা- এগুলি সামান্য কর্তব্য। এছাড়াও বৈশ্যের প্রমুখ কর্তব্য হল- কৃষি কাজ করা, ব্যাপার করা, পশুপালন করা এবং ব্যাজের থেকে ধন লাভ করা। 'বৈশ্যস্যাধিকং কৃষি বাণিকপাশুপাল্যকুসীদম্'।[৬৯]

শূদ্র

ধর্মসূত্রে শূদ্রের স্থিতি অন্য তিন বর্ণ অপেক্ষা অত্যন্ত নিকৃষ্ট হিসাবে লক্ষ্য করা যায়। সমাজে এই বর্ণের স্থান সব থেকে নীচে। শূদ্র প্রসঙ্গেও নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন এবং দায়িত্ব কর্তব্যের অবতারণা করা হয়েছে। যেমন *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে* স্পষ্টতই উল্লেখ রয়েছে যে- 'শুশ্রূষা শূদ্রস্যেতরেষাং বর্ণানাম্'।[৭০] সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী তিন বর্ণের সেবা করাই শূদ্রের মূল কর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য- এই

[৬৮] আ. ধ. সূ. ২/৫/১০/৮

[৬৯] গৌ. ধ. সূ. ২/১/৫০

[৭০] আ. ধ. সূ. ১/১/১/৭

ত্রিবিধ গোত্রের পাশাপাশি শূদ্রের অবস্থান যে স্বতন্ত্র তা বলতেই হয়। *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের* পাশাপাশি অন্যত্র আমরা নানা ধরনের তথ্য খুঁজে পাই। বিশেষত *বৌধায়ন ধর্মসূত্র*কার যখন বলেন প্রজাপতির পা থেকে শূদ্রের উৎপত্তি, তখন শূদ্র সম্পর্কিত সমকালীন সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই বিষয়ে জীবিকা অংশে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

নিষাদ

বৈদিক যুগে আমরা মূলত নিষাদকে অনার্য জাতি হিসেবেই পরিচয় পেতে দেখি, একটি অতি প্রাচীন জাতিগোষ্ঠী। এরা মূলত প্রান্তিক গ্রাম অঞ্চলে কিংবা অরণ্যবহুল অঞ্চলে বসবাস করত। পরবর্তী কালে কোনও কোনও ইতিহাসবিদের গবেষণায় 'নিষাদ'-দের 'ভিল' গোষ্ঠীর সঙ্গে এক করে দেখানো হয়েছে। নৃতত্ত্ববিদ্যা অনুসারে এদের বলা হয় অস্ট্রিক নরগোষ্ঠী। অর্থাৎ নিষাদ হল প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে উল্লিখিত জনজাতি। প্রাচীন গ্রন্থে এই উপজাতি দ্বারা শাসিত বেশ কয়েকটি রাজ্যের উল্লেখ রয়েছে।[৭১] *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* নিষাদকে ব্রাহ্মণ পুত্র আর শূদ্র পত্নীর সন্তান বলে মনে করা হয়।[৭২] *গৌতম ধর্মসূত্র*কার ব্রাহ্মণ পুত্র আর বৈশ্য বর্ণের পত্নীর পুত্রকে নিষাদ বলেছেন।[৭৩]

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ পুরুষের ঔরসে দ্ব্যন্তরিতা ও পরিণীতা শূদ্রা নারীর গর্ভে যে সন্তান জন্ম নেয় সেই সন্তান জাতিতে নিষাদ বা পারশব নামে

---

[৭১] India of vedic kalpasutras - p.g- 116

[৭২] বৌ. ধ. সূ. ১/৮/১৬/৭

[৭৩] গৌ. ধ. সূ. ১/৪/১৪

পরিচিত।[৭৪] *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে* বলা হয়েছে ব্রাহ্মণের সঙ্গে শূদ্রের বিবাহ হয়ে যে সন্তান উৎপন্ন হয় তাকে নিষাদ বলা হয়।[৭৫]

৩.২.২- বর্ণসঙ্কর তত্ত্ব

চার বর্ণের স্ত্রী পুরুষের পারস্পরিক সম্বন্ধে অনেক বর্ণসংকর জাতির উদ্ভব ধর্মসূত্রের সময়ের আগে থেকেই পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ গ্রন্থ ও উপনিষদ গ্রন্থে বর্ণসংকর তত্ত্বের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। যেমন- ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আন্ধ্রবর্ণ[৭৬], তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আযোগু[৭৭], কিরাত[৭৮], কুলাল[৭৯], চণ্ডাল[৮০], তক্ষা[৮১], রথকার[৮২], সুবর্ণকার[৮৩] ও সূতবর্ণ[৮৪]। ছান্দোগ্যোপনিষদে ক্ষত্তা[৮৫] ও চণ্ডাল[৮৬] বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। ধর্মসূত্রের কালে বর্ণব্যবস্থাকে দৃঢ়তাপূর্বক রাখার অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু সামাজিক প্রবৃত্তির ফলে তা ব্যর্থ হয়ে পড়ে। ফলে অনেক বর্ণের পারস্পরিক সম্বন্ধের কারণে সংকর জাতির উৎপত্তি বেড়েই চলেছে। প্রায় সকল

---

৭৪ মনু. ১০/৮

৭৫ যজ্ঞ. ১/৯১

৭৬ ঐ. ব্রা. ৩৩/৬

77 তৈ. ব্রা. ৩৩/4/১

৭৮ তৈ. ব্রা. ৩৩/4/১৪

৭৯ তৈ. ব্রা. ৩৩/4/১

৮০ তৈ. ব্রা. ৩৩/4/১৭

৮১ তৈ. ব্রা. ৩৩/4/২

৮২ তৈ. ব্রা. ৩৩/4/২

৮৩ তৈ. ব্রা. ৩৩/4/১৪

৮৪ তৈ. ব্রা. ৩৩/4/১

৮৫ ছা. উ. 4/১/৬

৮৬ ছা. উ. ৫/১০/৮

ধর্মসূত্রেই এই বর্ণসংকর তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। বর্ণসংকর তত্ত্বের নানাবিধ ব্যাখ্যায় ধর্মসূত্রসমূহের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সামাজিক স্তরবিন্যাসের নানাবিধ প্রকোষ্ঠগুলির চিহ্নিতকরণে আমরা অনুধাবন করতে পারি স্তরবিশেষে স্বতন্ত্র অধিকার এবং কর্তব্যসমূহকে। ধর্মসূত্রসমূহে চণ্ডালদের শূদ্র পিতা ও ব্রাহ্মণী মাতার সংযোগের ফলস্বরূপ উৎপন্ন সংকর জাতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[৮৭]

৩.২.৩- ব্রাত্য ও দাস

আমরা তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয়ী সংহিতায় 'ব্রাত্য' নামক একশ্রেণীর মানুষের পরিচয় পাই। বিশেষত 'পুরুষমেধ' প্রসঙ্গে তার উল্লেখ রয়েছে। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণেও তা বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও অথর্ববেদ, কাত্যায়ন, লাট্যায়ন, আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রেও ব্রাত্য ও দাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে যে চার শ্রেণীর মানুষকে পতিত বা জাতি-বর্হিভূত বলে গণ্য করা হয়েছে, তাতে প্রথমেই 'হীন' ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে মূলত এই হীন পর্যায়ের মানুষদেরকেই ব্রাত্য বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এরা মূলত অনার্য কিংবা অধঃপতিত। যদিও এ নিয়ে বির্তকও রয়েছে। কেননা কোথাও কোথাও ব্রাত্য বলতে মূলত নির্দিষ্ট গোষ্ঠীভুক্ত কোনও জাতিকেও চিহ্নিত করা হয়েছে, যাঁরা মূলত আর্যভাষায় কথা বলতেন। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ অনুসারেও আমরা তাই পেয়ে থাকি। এই বর্ণনা অনুসারে আমরা এও পাই যে, তাঁরা কৃষিকাজ কিংবা বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত নন। আবার ব্রহ্মচর্যের নিয়মাবলীকেও অনুসরণ করতেন না।[৮৮] আপস্তম্ব ধর্মসূত্রেও ব্রাত্যদের উল্লেখ পাওয়া

[৮৭] গৌ. ধ. সূ. ৪/১৫ -১৬, বৌ. ধ. সূ. ১/৯/৭

[৮৮] প. ব্রা. ৭/১/২

যায়। মূলত যাঁদের উপনয়ন কিংবা অন্যান্য সংস্কার হয়নি, তাঁদের ব্রাত্য বলে চিহ্নিত করা হয়।[৮৯]

৩.২.৪- বিবিধ জীবিকা

বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজে অর্থ উপার্জনের মূল কাণ্ডারী হলেন গৃহকর্তা। পরিবারের সদস্যবর্গের সুষ্ঠু ভরণপোষণের জন্য প্রত্যেক বর্ণের এই কর্তার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট জীবিকার বিধান দেওয়া হয়েছে।

ব্রাহ্মণের জীবিকা-

আপস্তম্বের মতে পূর্বোল্লিখিত ষড়্‌বিধ কর্ম ব্রাহ্মণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল; যার মধ্যে অধ্যাপনা, যাজন এবং প্রতিগ্রহ তার বৃত্তি। এছাড়া দায় (পিতৃ-পিতামহাদিক্রমে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধন) এবং শিল ও উঞ্ছ কেও তিনি ব্রাহ্মণের জীবিকা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৯০]

প্রবচন, যাজন এবং প্রতিগ্রহে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার আছে বলে *গৌতম ধর্মসূত্র*কারও উল্লেখ করেছেন এবং এরই সাথে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে (আপাৎকালীন বৃত্তি হিসেবে নয়) কৃষি, বাণিজ্য এবং কুসীদকর্মকে ব্রাহ্মণের বৃত্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও এগুলি নিজে না করে অপরকে দিয়ে করানোর কথা বলা হয়েছে।[৯১]

---

[৮৯] আ. ধ. সূ. ১/১/১/২২ - ১/২/১০

[৯০] স্বকর্ম ব্রাহ্মণস্যাঽধ্যয়নমধ্যাপনং যজ্ঞো যাজনং দানং প্রতিগ্রহণং দাযাদ্যং সিলোঞ্চঃ। আ. ধ. সূ. ২/৫/১০/৫

[৯১] কৃষিবাণিজ্যে বাঽস্বযংকৃতে। কুসীদং চ। গৌ. ধ. সূ. ২/১/৫-৬

মনু[৯২] ও যাজ্ঞবল্ক্যের[৯৩] মতে, ব্রাহ্মণ যদি অধ্যাপনা, যাজনের দ্বারা জীবনধারণে সক্ষম না হন, তাহলে তিনি (প্রতিগ্রহণ পরায়ণ না হয়ে) বরং শিল এবং উঞ্ছ বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবেন।

ক্ষত্রিয়ের জীবিকা-

আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে ক্ষত্রিয়ের জীবিকা সম্পর্কে উল্লিখিত আছে- 'তেষাং পূর্বঃ পূর্বো জন্মতরশ্রেযান্'।[৯৪] অধ্যাপনা, যজ্ঞ করা, দান গ্রহণ করা- এই তিনটি কাজ ব্যতীত অবশিষ্ট আর যা কর্ম আছে সেগুলিই ক্ষত্রিয়দের জন্য নির্ধারিত। তবে বিবিধ কার্য সম্পাদনের মধ্যে দুটি বিশেষ কর্মের নাম আলাদা করে উল্লেখ করতে হয়। সেগুলি হল- দণ্ড দেওয়া এবং যুদ্ধ করা। তাই *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র* অনুসারেই বলতে হয়- 'এতান্যেব ক্ষত্রিয়স্যাঽধ্যাপনযাজনপ্রতিগ্রহণানীতি পরিহাপ্য দণ্ডযুদ্ধাধিকানি'।[৯৫] *বৌধায়ন ধর্মসূত্র* অনুসারে আমরা অবশ্য বিকল্প কিছু মতামতকেও খুঁজে পেতে পারি। যেমন বলা হয়েছে- ক্ষত্রিয়েরা বলবান হবেন, রাজ্য-শক্তি বৃদ্ধির জন্য বেদের অধ্যয়ন করবেন, যজ্ঞ করবেন, দান করবেন এবং শাস্ত্রকে ধারণ করবেন। এছাড়াও ধন এবং প্রাণীর জীবন রক্ষা করাও হল ক্ষত্রিয়ের কাজ।

---

[৯২] শিলোঞ্ছমপ্যাদদীত বিপ্রোঽজীবন্ যতস্ততঃ।
প্রতিগ্রহাচ্ছিলঃ শ্রেযাংস্তভোঽপ্যুঞ্জঃ প্রশস্যতে।। মনু. ১০/১১২

[৯৩] যজ্ঞ. ১/১২৮

[৯৪] আ. ধ. সূ. ১/১/১/৫

[৯৫] আ. ধ. সূ. ২/৫/১০/৭

বৈশ্যের জীবিকা-

আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে বৈশ্যের জীবিকা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। সেখানে ক্ষত্রিয়ের মতোই বৈশ্যেরও কর্ম ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করেছেন। যে কর্মপ্রণালী বৈশ্যদের জন্য উপযুক্ত বলেও ধরা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- অধ্যয়ন করা, যজ্ঞ করা, দান করা, কৃষি, ব্যাপার, পশুপালন ইত্যাদি। *বৌধায়ন ধর্মসূত্রের* উল্লেখে তাই আমরা এ কথাই স্পষ্টত বলতে পারি যে- 'বিট্ স্বধ্যযনযজন-দানকৃষিবাণিজ্যপশুপালনসংযুক্তং কর্মণাং বৃদ্ ধ্যৈ'।[৯৬] *বিষ্ণু ধর্মসূত্রে* বৈশ্যের কর্ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে পশুপালনের উল্লেখ রয়েছে[৯৭] এবং অন্যের বীজ সুরক্ষিত করাও যে বৈশ্যের কর্ম, তারও উল্লেখ রয়েছে।[৯৮]

এ বিষয়ে মনু বলেছেন, পশুদের রক্ষা করা, দান করা, যজ্ঞ করা, অধ্যয়ন করা, বাণিজ্য (স্থলপথ ও জলপথ প্রভৃতির মাধ্যমে বস্তু আদান প্রদান করে ধন উপার্জন), কুসীদ (বৃদ্ধিজীবিকা, টাকা সুদে খাটানো) এবং কৃষিকাজ- এগুলি ব্রহ্মা কর্তৃক বৈশ্যদের জন্য নিরূপিত ছিল।

'পশুনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্ পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ'।।[৯৯]

---

[৯৬] বৌ. ধ. সূ. ১/১০/১৮/৪

[৯৭] বি. ধ. সূ. ২/৭

[৯৮] বি. ধ. সূ. ২/১৩

[৯৯] মনু. ১/৯০

শূদ্রের জীবিকা-

ত্রৈবর্ণিক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের শুশ্রূষাই শূদ্রের প্রধান কর্ম। *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে 'পত্তো হ্যসৃজ্যন্তেতি'।[১০০] শূদ্রের কর্তব্য সম্পর্কে এখানে আরও বলা হয়েছে যে- যাঁরা নিজে থেকেই উচ্চবর্ণের সেবা করবেন, তাঁদেরকেই মূলত শূদ্র বলে চিহ্নিত করা যাবে। *বৌধায়ন ধর্মসূত্র* অনুসারে তাই বলতে হয়, 'শূদ্রেষু পূর্বেষাং পরিচর্যা'।[১০১] অবশ্য *বিষ্ণু ধর্মসূত্রে* আমরা পাই শূদ্রকে শিল্পবৃত্তির দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করতে হবে।[১০২]

*গৌতম ধর্মসূত্র*কার বলেছেন যে শূদ্র হল চতুর্থ বর্ণ, যাঁরা সংস্কার কর্মে দ্বিজাতির থেকে ভিন্ন। 'শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণ একজাতিঃ'।[১০৩] শূদ্রের কর্তব্যের বর্ণনা করতে গিয়ে ধর্মসূত্রকার বলেছেন- পরিচর্চা চোত্তরেষাম্। অর্থাৎ শূদ্র নিজে থেকেই উচ্চ বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) সেবা করবেন।[১০৪]

মনুর বিচার অনুসারে, ব্রহ্মা শূদ্রের জন্য একটি কাজই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা হল কোনও অসূয়া অর্থাৎ নিন্দা না ক'রে এই তিন বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শুশ্রুষা করা-

'একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশৎ।

---

[১০০] বৌ. ধ. সূ. ১/১০/১৮/৬

[১০১] বৌ. ধ. সূ. ১/১০/১৮/৫

[১০২] শ্রুদ্রস্য সর্বশিল্পানি। বি. ধ. সূ. ২/১৩

[১০৩] গৌ. ধ. সূ. ২/১/৫১

[১০৪] গৌ. ধ. সূ. ২/১/৫৭

এতেষামেব বর্ণানাং শূশ্রুষামনসূয়যা'।।[১০৫]

৩.২.৫- চতুরাশ্রম

প্রচীন ভারতীয় জীবনযাত্রায় আশ্রমব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাচীন ঋষিগণ মানব-জীবনের সামগ্রিক অবস্থাকে একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনায় বিভক্ত করে চালনা করবার কথা বলেছেন। সেই ব্যবস্থাপনাকেই নির্দিষ্ট রূপ দেবার জন্য মনুষ্য-জীবনকে তাঁরা চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। সেগুলি হল ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। এই ব্যবস্থা প্রণালীকে আশ্রম-ব্যবস্থা বলা হয়। 'আশ্রম' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'শ্রম' ধাতু থেকে যার অর্থ হল প্রয়াস অথবা পরিশ্রম করা। এক কথায় এটি এমন একটি জীবনকাল যেখানে ব্যক্তিরা খুব পরিশ্রম করতেন।[১০৬] আশ্রম-ব্যবস্থার প্রচলন বৈদিক যুগ থেকেই ছিল। বেশির ভাগ ধর্মসূত্রকার প্রত্যেকটি আশ্রমের নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ কিছু প্রকার ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্যের বিধান দিয়েছেন। আপস্তম্ব ধর্মসূত্র অনুসারে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাকেও যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ধর্মসূত্রকারদের মত অনুসারে, আচার্যকুল (আচার্যকুলের মধ্যে পড়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রম), গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং মৌন (অর্থাৎ সন্ন্যাস) এই চারটি আশ্রম রয়েছে। আপস্তম্ব ধর্মসূত্র অবলম্বনে আমরা পাই- চত্বার আশ্রমা গার্হস্থ্যম্, আচার্যকুলং, মৌনং, বানপ্রস্থমিতি।[১০৭] অতঃপর আমরা বৌধায়ন ধর্মসূত্রেও চার প্রকার আশ্রমের কথা

[১০৫] মনু. ১/৯১

[১০৬] ধ. শা. ই. পৃষ্ঠা- ২৬৭

[১০৭] আ. ধ. সূ. ২/৭/২১/১

পাই, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং পরিব্রাজক অর্থাৎ সন্ন্যাস। “ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বানপ্রস্থঃ পরিব্রাজক ইতি।[১০৮]

গৌতম ধর্মসূত্রে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, ভিক্ষু আর বৈখানস এই চার আশ্রমের নাম পাওয়া যায়। ‘ব্রহ্মচারী গৃহস্থো ভিক্ষু বৈখানসঃ’।[১০৯]

ব্রহ্মচর্য আশ্রম

ব্রহ্মচারী পদটি দুটি শব্দের সংযোগে নিষ্পন্ন হয়- ব্রহ্ম এবং চর্য। ‘ব্রহ্ম’ শব্দ ‘বৃন্‌হ’ ধাতু থেকে এবং ‘চর্য’ শব্দ ‘চর’ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়। ‘ব্রহ্মচারী’ শব্দের প্রথম প্রয়োগ আমরা *ঋগ্বেদে* দেখতে পাই।[১১০] ব্রহ্মচারীকে অধ্যয়নের জন্য গুরুকুলে আটচল্লিশ বছর থাকার কথা বলা হয়েছে। ‘অষ্টাচত্বারিংশদ্বর্ষাণি পৈরাণং বেদব্রহ্মাচর্যম্’।[১১১] আবার বিবিধ ধর্মসূত্রেও আমরা ব্রহ্মচারীর কথাও উল্লেখ করতে দেখি। চতুরাশ্রম ব্যবস্থায় প্রথম আশ্রমটি হল ব্রহ্মচর্যাশ্রম। ব্রহ্মচর্য আশ্রমকে মনুষ্যজীবনেরও প্রথম আশ্রম বলা হয়। এই আশ্রমের সময়সীমা পঁচিশ বছর বলা হয়। এই আশ্রম ব্যবস্থা হল জীবন গড়ে তোলা ও বিদ্যা অধ্যয়নের সময়। এই আশ্রম ব্যবস্থায় ব্যক্তিকে সংযম, নিয়ম পূর্বক জীবন পরিচালনা করে স্বাস্থ্য এবং চরিত্র গঠন করবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে সমগ্র জীবনের সঞ্চলনার্থ আবশ্যক জ্ঞান-রাশি, বিবেচনা মানুষ এই আশ্রমেই লাভ করে। *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের* মতে ব্রহ্ম থেকে বেদের গ্রহণ হয়, আর তাকে অধ্যয়নের জন্য

---

[১০৮] বৌ. ধ. সূ. ২/৬/১১/১৪

[১০৯] গৌ. ধ. সূ. ১/৩/২

[১১০] ঋ. ১০/১০৯/৫

[১১১] বৌ. ধ. সূ. ১/২/৩/১

যিনি ব্রত গ্রহণ করেন তিনি ব্রহ্মচারী।[১১২] ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ব্রহ্মচারীদের কঠিন নিয়ম পালন করার কথা বলা হয়েছে আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে। এই ধর্মসূত্র অনুসারে ব্রহ্মচারীরা সর্বদা তাঁদের গুরুর নির্দেশ মতেই জীবন পরিচালনা করবেন। তাঁরা গুরুর ভালো চাইবেন এবং কখনওই কথার মধ্যে দিয়ে গুরুর বিরোধিতা করবেন না। 'হিতকারী গুরোরপ্রতিলোমযন্ বাচা'।[১১৩] দিনের বেলায় তাঁরা কখনওই ঘুমোবেন না। 'ন দিবা স্বপ্যাত্'।[১১৪] গুরুর নিকট শয়নকালে তাঁকে অপেক্ষাকৃত নিম্ন শয্যায় শয়ন করতে হবে। 'অধাসনশায়ী'।[১১৫] ব্রহ্মচর্যাশ্রমে খাদ্যাভ্যাসের উপরেও নানা বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। যেমন- মশলাজাতীয় খাদ্য, মধু এবং মাংস খাওয়া যাবে না- এরকম নানা বিধান আমরা দেখতে পাই। তথা 'ক্ষারলবণমধুমংসানি'।[১১৬] ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ব্রহ্মচারীদের কঠিন নিয়ম পালনের কথা আমরা *বৌধায়ন ধর্মসূত্রেও* দেখতে পাই। *বৌধায়ন ধর্মসূত্রের* মতে ব্রহ্মচারীকে প্রতিদিন বেদ পড়ার অভ্যাস করতে হবে। ব্রহ্মচারীরা যেমন মধু, মাংস ভক্ষণ করবেন না তেমনি ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, শোক, ঈর্ষা, দ্বেষ থেকে দূরে থাকবেন। এমনকি নাচ-গান, বাজনা-বাজানো, চন্দনের মালা পরা, ছাতা ব্যবহার করা- এইসব তাঁদের পরিত্যাগ করতে হবে।সেখানে উল্লিখিত রয়েছে, 'নৃত্তগীতবাদিত্রগন্ধমাল্যোপানচ্ছত্রধারণাঞ্জনাভ্যঞ্জন-বর্জো'।[১১৭] এছাড়াও বলা হয়েছে, সর্বদা সত্য কথা বলতে হবে, লজ্জা এবং অহংকার

---

[১১২] আ. ধ. সূ. ১/১/২/১১

[১১৩] আ. ধ. সূ. ১/১/১/২০

[১১৪] আ. ধ. সূ. ১/১/১/২৪

[১১৫] আ. ধ. সূ. ১/১/১/২১

[১১৬] আ. ধ. সূ. ১/১/১/২৩

[১১৭] বৌ. ধ. সূ. ১/২/৩/১

সর্বদা পরিত্যজ্য। 'সত্যবাদী হ্রীমাননহঙ্কারঃ'।[118] ব্রহ্মচারীকে গুরুর আগে ঘুম থেকে উঠতে হবে এবং গুরুর ঘুমানোর পর ঘুমোতে হবে- 'পূর্বোত্থায়ী জঘন্যসংবেশী'।[119]

গৌতম ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে- ব্রহ্মচারীকে অশ্লীল বাণী এবং মাদক বস্তুর পরিত্যাগ করতে হবে। 'শুক্লবাচো মদ্যং নিত্যং ব্রাহ্মণঃ'।[120]

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, ব্রহ্মচারীর বেদ অধ্যয়নের জন্য গুরুকুলে বা গুরুগৃহে বাস করার সময় ছত্রিশ বৎসর। ব্রহ্মচারী ঋক্, যজুঃ ও সাম- এই তিন বেদ অধ্যয়ন করবেন এবং তাঁকে প্রতি বেদের জন্য বারো বছর সময় ব্যয় করতে হবে। অথবা তিনি তার অর্ধেক সময় ধরে বেদত্রয় অধ্যয়ন করবেন, অথবা পাদিক বা চতুর্থাংশকাল যাবৎ অর্থাৎ নয় বৎসর ধরে বেদত্রয় অধ্যয়ন করবেন।

'ষট্ ত্রিংশদাব্দিকং চর্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা'।।[121]

গার্হস্থ্য আশ্রম

ব্রহ্মচর্য আশ্রমের পরে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করবার নিয়ম দেখা যায়। ব্রহ্মচারীকে শিক্ষা সমাপ্তিতে স্নাতক উপাধি লাভ করে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করতে হয়। ধর্মসূত্রগুলিতে গার্হস্থ্যের কিছু নিয়ম ও ব্রতের কথা বলা হয়েছে। যেমন আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে আমরা দেখতে পাই, দিনে কেবলমাত্র দুই সময়ে (সকাল ও সন্ধ্যা)

---

[118] বৌ. ধ. সূ. ১/২/৩/২১

[119] বৌ. ধ. সূ. ১/২/৩/২২

[120] গৌ. ধ. সূ. ১/২/২৬

[121] ম. নু. ৩/১

ভোজন করতে হবে। 'কালযোর্ভোজনম্'।[১২২] অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে স্ত্রী ও স্বামী দুজনকে উপবাস করতে হবে। 'পর্বসু চোভযোরুপবাসঃ'।[১২৩] বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এই তিথিতে দিনে কেবল একবার অন্ন গ্রহণ করলেও তাকে উপবাস হিসেবেই ধরা হবে। 'ঔপবস্তমেব কালান্তরে ভোজনম্'।[১২৪] বৌধায়ন ধর্মসূত্রেও গার্হস্থ্যের কিছু নিয়মনীতির পরিচয় পাই। সেগুলি হল- তপস্যার জন্য স্নান করতে হবে। 'তপস্যমবগাহনম্'।[১২৫] দেবতার উদ্দেশ্যে জল দিয়ে তর্পণ করতে হবে এবং তারপর পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করতে হবে। 'দেবতাস্তর্পয়িত্বা পিতৃর্পণম্'।[১২৬]

গৌতম ধর্মসূত্রকারের মত থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে গার্হস্থ্যাশ্রমই হল সব আশ্রমের মূল, কেননা এই আশ্রম থেকেই সন্তানের উৎপত্তি হয়। 'তেষাং গৃহস্থো যানিরপ্রজনত্বাদিতরেষাম্'।[১২৭]

মনুসংহিতায় গার্হস্থ্যাশ্রম বিষয়ে বলা হয়েছে, দ্বিজাতিগণ চার ভাগে বিভক্ত জীবনের প্রথম চতুর্থভাগ অর্থাৎ জন্ম থেকে আরম্ভ করে যতদিন না বেদগ্রহণ সমাপ্ত হয় ততদিন পর্যন্ত গুরুসমীপে বাস করে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে জীবনের দ্বিতীয়-চতুর্থ ভাগ দারপরিগ্রহ পূর্বক অর্থাৎ বিবাহ করে গার্হস্থ্যাশ্রম আশ্রয়

---

[১২২] আ. ধ. সূ. ২/১/১/২

[১২৩] আ. ধ. সূ. ২/১/১/৪

[১২৪] আ. ধ. সূ. ২/১/১/৫

[১২৫] বৌ. ধ. সূ. ২/৩/৫/১

[১২৬] বৌ. ধ. সূ. ২/৩/৫/১

[১২৭] গৌ. ধ. সূ. ১/৩/৩

করবেন।[১২৮] *যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে* বলা হয়েছে ব্রহ্মচর্যাশ্রম সমাপ্ত করে গার্হস্থ্যাশ্রমে বিধিপূর্বক প্রবেশ করবেন এবং শুভ লক্ষণ সম্পন্ন স্ত্রীকে বিবাহ করবেন।[১২৯]

বানপ্রস্থ আশ্রম

আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে বানপ্রস্থের জন্যে কিছু নির্দিষ্ট নিয়মের উল্লেখ রয়েছে- বানপ্রস্থে কেবল একটি অগ্নি প্রজ্বলিত করবেন, ঘরে থাকবেন না, কোনও সুখভোগ করবেন না, কোনও শরণ থাকবে না, এক্ষেত্রে মৌন থাকতে হবে, কেবলমাত্র দৈনিক অধ্যয়নের সময় কথা বলতে পারবেন। ‘তস্যোপদিশন্ত্যেকাগ্নিরনিকেতসস্যাদশর্মাঽশরণো মুনিঃস্বাধ্যায় এবোত্সৃজমানো বাচম্’।[১৩০] *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* বানপ্রস্থকে দুই ভাগে ভাগ করেছে- ১) পচমানক ২) অপচমানক। ‘অথ বানপ্রস্থস্য দ্বৈবিধ্যম্। পচমানকা অপচমানকাশ্চেতি’।[১৩১] অর্থাৎ অগ্নি প্রজ্বলিত করে সায়ং প্রাতঃ হবন করার বিধান দেওয়া হয়েছে। যিনি আগুনে রান্না করেন তিনি পচমানক, আর যিনি আগুনে রান্না করেন না তাঁকে অপচমানক বাণপ্রস্থী বলা হয়। *বিষ্ণু ধর্মসূত্রে* বানপ্রস্থ আশ্রম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে গার্হস্থ্যাশ্রম থেকে মানুষ যখন দেখবেন যে, নিজদেহে বলি অর্থাৎ শরীরচর্মের শিথিলতা ও পলিত অর্থাৎ চুলের পক্কতা এসেছে তখন তিনি বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করবেন।[১৩২]

---

[১২৮] চতুর্থমায়ুষো ভাগমুষিত্বাদ্যং গুরৌ দ্বিজঃ।
দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ।। মনু. ৪/১

[১২৯] অবিলুপ্তব্রহ্মচর্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিযযুদ্ধহেত্।
অনন্যপূর্বিকাং কান্তামসপিন্ডাং যবীযসীম।। যজ্ঞ. ১/৫২

[১৩০] আ. ধ. সূ. ২/৯/২১/২০

[১৩১] বৌ. ধ. সূ. ৩/৩/৩/১-২

[১৩২] গৃহী বলীপলিতদর্শনে বনাশ্রযো ভবেত্। বি. ধ. সূ. ৯৪/১

*গৌতম ধর্মসূত্র*কার বানপ্রস্থকে বৈখানস বলেছেন। ‘ব্রহ্মচারী গৃহস্থো ভিক্ষুবৈখানসঃ’।[১৩৩] এই ধর্মসূত্রে বানপ্রস্থের বিষয়ে বলা হয়েছে যে বানপ্রস্থীকে কন্দমূল আর ফল খেয়ে বনে থাকতে হবে এবং তাঁকে বনে থেকে তপস্যা করতে হবে। ‘বৈখানসো বনে মূলফলাশো তপঃ শীলঃ’।[১৩৪]

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন বর্ণের লোক স্নাতক হয়ে এইরকম যথাবিধি গার্হস্থ্যাশ্রমে অবস্থান করে তারপর নিয়মযুক্ত হয়ে ইন্দ্রিয়সংযমপূর্বক বিধিমতে বনে বাস করবেন অর্থাৎ বানপ্রস্থাশ্রমের অনুষ্ঠান করবেন।[১৩৫] গৃহস্থাশ্রম থেকে মানুষ যখন দেখবেন যে, নিজদেহ বলি অর্থাৎ শরীরচর্মের শিথিলতা ও পলিত অর্থাৎ চুলের পক্কতা উপস্থিত হয়েছে এবং যখন পুত্রের পুত্র অর্থাৎ পৌত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে তখন বানপ্রস্থ ধর্মের জন্য বনে বাস করবেন।[১৩৬] যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে বানপ্রস্থের উল্লেখ করতে গিয়ে গ্রন্থকার বলেছেন, যিনি কঠোর নিয়মের সঙ্গে বনে বসবাস করেন অথবা ঘুরে বেড়ান তাঁকে বানপ্রস্থী বলা হয়।[১৩৭]

---

[১৩৩] গৌ. ধ. সূ. ১/৩/২

[১৩৪] গৌ. ধ. সূ. ১/৩/২৫

[১৩৫] এবং গৃহাশ্রম স্থিত্বা বিধিবৎ স্নাতকো দ্বিজঃ।
বনে বসেতু নিয়তো যথাবদ্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।। মনু. ৬/১

[১৩৬] গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্ বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ।। মনু. ৬/২

[১৩৭] বনে প্রকর্ষেণ নিয়মেন চ তিষ্টতি চরতীতি বনপ্রস্থ।
বনপ্রস্থঃ এব বানপ্রস্থঃ। যজ্ঞ. ৩/৪৫

সন্ন্যাস আশ্রম

আশ্রম ব্যবস্থার মধ্যে চতুর্থ ও অন্তিম আশ্রম হচ্ছে সন্ন্যাস। একে মানব জীবনের শেষ ক্ষেত্র হিসেবে মনে করা হয়। *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে* সন্ন্যাসীকে মৌন বলা হয়েছে। 'চত্বার আশ্রম গার্হস্থ্যম, আচার্যকুলং, মৌনং বানপ্রস্থ্যমিতি'।[১৩৮] এই আশ্রম অবলম্বনকারীর অগ্নিকে ছেড়ে থাকতে হবে, ঘরের চিন্তা কিংবা সুখ চিন্তাকে পরিত্যাগ করতে হবে। তাঁকে নীরবতা পালন করতে হবে, শুধুমাত্র প্রত্যেক দিনের দৈনিক অধ্যাবসায়ের সময় প্রয়োজনীয় তিনি কথা বলতে পারবেন। গ্রামে ভিক্ষা করতে গেলে তিনি ততটা ভিক্ষাই গ্রহণ করবেন যতটা তাঁর জীবিকা নির্বাহে প্রয়োজন। তাঁকে সাংসারিক জীবন থেকে মুক্ত হয়ে সংসারবিহীন জীবন যাপন করতে হবে। 'অনগ্নিরনিকেতসস্যদশর্মাঽশরণো মুনিঃ স্বাধ্যায় এবোস্তৃজমানো বাচং গ্রামে প্রাণবৃত্তি প্রতিলভ্যাঽনিহোঽনমুত্রশ্চরেত্'।[১৩৯] অপরদিকে বৌধায়ন ধর্মসূত্রে সন্ন্যাসীর আর এক নাম পরিব্রাজক বলে মনে করা হয়। 'ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বানপ্রস্থঃ পরিব্রাজক ইতি'।[১৪০] সন্ন্যাসীকে সর্বদা সত্যবাদী হতে হবে, তাঁর আচরণ, কর্ম, কথায় যেন কারও কোনও ক্ষতি না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। তিনি যেমন বলপূর্বক ধন গ্রহণ করবেন না, তেমনি তাঁর স্ত্রীসম্ভোগের ইচ্ছা থাকাও অবাঞ্ছিত হিসাবে পরিগণিত হবে। তাঁকে কেবল ব্রহ্মস্বরূপ প্রণবের ধ্যান করতে হবে-এজাতীয় উল্লেখ বৌধায়ন ধর্মসূত্রে সন্ন্যাসীর সম্পর্কে পাওয়া যায়। 'অথেমানি ব্রতানি

---

[১৩৮] আ. ধ. সূ. ২/৯/২১/১

[১৩৯] আ. ধ. সূ. ২/৯/২১/১০

[১৪০] বৌ. ধ. সূ. ২/৬/১১/১৪

ভবন্তি-অহিংসা সত্যমস্তৈন্যং মৈমুনস্য চ বর্জনং ত্যাগ ইত্যেব’। ‘প্রণবো ব্রহ্মা প্রণবং ধ্যায়েত’।[১৪১]

গৌতম ধর্মসূত্রে সন্ন্যাসীকে ‘ভিক্ষু’ শব্দে অভিহিত করা হয়েছে। ‘ব্রহ্মচারী গৃহস্থো ভিক্ষুবৈখানসঃ’।[১৪২] সন্ন্যাস আশ্রমের কর্ত্তব্য এবং নিয়মগুলি গৌতম ধর্মসূত্রকারও বৌধায়ন ধর্মসূত্রকারের মত অনুসারেই বর্ণনা করেছেন।[১৪৩]

৩.২.৬- দায়ভাগ

দায়ভাগ কথার অর্থ আত্মীয়র (পিতা, পিতামহ) ধন আত্মীয়ের (পুত্র, পুত্রী) মধ্যে বিভাজন করাকে দায়ভাগ বলা হয়। দায় শব্দের প্রয়োগ বৈদিক যুগ থেকে লক্ষ্য করা যায়। ঋগ্বেদে দায় শব্দের প্রয়োগ ‘পুরস্কার’ তথা ‘ভাগ’ অর্থ রূপে করা হয়েছে।[১৪৪] সকল ধর্মসূত্রে ব্যক্তির আর্থিক অধিকারের রূপে দায়বিভাগের নিয়ম বলা হয়েছে। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে দায় পৈতৃক সম্পত্তি কে বলা হয়েছে।[১৪৫] দায়বিভাগ পিতা নিজের জীবৎকালে নিজের পুত্রদের করেন অথবা পিতার মৃত্যুর পরে সকল পুত্র নিজেরাই এর বিভাজন করে নেন। *আপস্তম্বধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে যে- ‘জীবন্ পুত্রেভ্যো দায়ং বিভজেত্ সমং ক্লীবমুন্মত্ত পতিতং চ পরিহাপ্য’।[১৪৬] অর্থাৎ পিতা জীবিত থাকাকালেই পুত্রদের মধ্যে দায় বিভাজন করবেন। *বিষ্ণুধর্মসূত্রে* পিতার

---

[১৪১] বৌ. ধ. সূ. ২/১০/১৮/২-৩২

[১৪২] গৌ. ধ. সূ. ১/৩/২

[১৪৩] গৌ. ধ. সূ. ১/৩/৬

[১৪৪] ঋ. বে. ২/৩২/৪, ১০/১১৪/১০

[১৪৫] তত্র দায়ো দাতব্যং দ্রব্যম্। বৌ. ধ. সূ. ২/৩/৩/২ গোবিন্দস্বামী ভাষ্য

[১৪৬] আ. ধ. সূ. ২/৬/১৪/১

দ্বারাই দায়বিভাগের নিয়ম উপলব্ধ হয়। যদি পিতা নিজের পুত্রদের মধ্যে নিজের সম্পত্তির বিভাজন করেন, তাহলে তিনি নিজের ইচ্ছে মতো বিভাজন করবেন।[১৪৭]

দায়বিভাগ কখন করা উচিত- এই বিষয়ে গৌতম ধর্মসূত্রকার উপযুক্ত দুটি বিকল্পের উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথায়- পিতার মৃত্যুর পর পুত্র সম্পত্তি বিভাজন করবেন অথবা মায়ের মৃত্যুর পর পিতা জীবিত অবস্থায় নিজের ইচ্ছেয় বিভাজন করতে পারেন।[১৪৮] বিভিন্ন ধর্মসূত্রের মত অনুসারে প্রমাণিত হয় যে, ধর্মসূত্রের কালে পিতা স্বয়ং পুত্রদের মধ্যে দায়বিভাগ করতেন এবং এটিকেই শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে মনে করতেন। দায়বিভাগের আগে পিতার মৃত্যু হলে পুত্ররা সমানভাবে নিজেদের মধ্যে সম্পত্তি বিভাজন করবেন- এই উল্লেখ আমরা প্রায় সব ধর্মসূত্রেই পাই।

৩.২.৭- উত্তরাধিকার ও সম্পত্তিবিভাগ

উত্তরাধিকারের বিষয়ে *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে 'পুত্রাভাবে যঃ প্রত্যাসন্নঃ সপিণ্ডঃ'[১৪৯] পুত্রের অভাবে যদি নিকটতম সপিণ্ড থাকেন তাহলে তিনি-ই হবেন এই সম্পত্তির আধিকারী। আরও বলা হয়েছে, "দুহিতা বা"[১৫০] অর্থাৎ পুত্রের অভাবে কন্যাও ওই সম্পত্তির আধিকারিণী হতে পারবেন। এছাড়াও বলা হয়েছে 'সর্বাভাবে রাজা দায়ং হরেত্'[১৫১] অর্থাৎ সপিণ্ড বা সগোত্রের অভাবে রাজা এই ধনের আধিকারী হবেন। *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* উত্তরাধিকারের বিষয়ে সূত্রকার বলেছেন যে যদি মৃত

---

[১৪৭] পিতা চেপুত্রান্বিভজেত্তস্য স্বেচ্ছা স্বযমুপার্জিতেঽর্থে। বি. ধ. সূ. ১৭/১

[১৪৮] উর্ধ্বং পিতুঃ পুত্রা রিক্থং ভজেরন্। নিবৃত্তে রজসি মাতুর্জীবতি চেচ্ছতি। গৌ. ধ. সূ. ৩/১০/১-২

[১৪৯] আ. ধ. সূ. ২/৬/১৪/২

[১৫০] আ. ধ. সূ. ২/৬/১৪/৩

[১৫১] আ. ধ. সূ. ২/৬/১৪/৪

ব্যক্তির কোনও পুত্র না থাকে তাহলে ওই সম্পত্তি সপিণ্ডের হয়।[১৫২] এছাড়াও বলা হয়েছে সপিণ্ড যদি কেউ না থাকেন তাহলে তা সকুল্যের হবে।[১৫৩] সকুল্যের অভাবে সেই সম্পত্তি কোনও পিতৃতুল্য আচার্য এবং তাঁর অভাবে অন্তেবাসী শিষ্য এবং তাঁর অভাবে যজ্ঞ কর্মকারী ঋত্বিক্ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন।[১৫৪] যজ্ঞকারী ঋত্বিকের অভাবে ব্রাহ্মণের সম্পত্তিকে তিন বেদ অধ্যায়নকারী বিদ্বানকে প্রদান করতে হবে।[১৫৫]

বিষ্ণু ধর্মসূত্রে উত্তরাধিকারের নিয়ম সম্পর্কে গ্রন্থকার আরও স্পষ্ট করে বলেছেন। এই ধর্মসূত্র অনুসারে বলা হয়েছে, 'পুত্রধনং পত্নাভিগমি'[১৫৬] পুত্রহীন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার যাবতীয় ধন সম্পত্তির অধিকারিণী হবেন তাঁর বিধবা পত্নী। পত্নীর অভাবে সেই ধন কন্যা পাবেন।[১৫৭] যদি কন্যাও না থাকেন আর মৃত ব্যক্তির পিতা জীবিত থাকেন তাহলে পিতা ওই ধনের অধিকারী হন।[১৫৮] পিতার অভাবে মা হন ওই ধনের অধিকারিণী।[১৫৯] আবার মায়ের অভাবে সেই ধন ভাই পাবেন।[১৬০] আর ভাই যদি না থাকেন তাহলে ভাইয়ের পুত্রেরা ওই ধনের অধিকারী হবেন।[১৬১] আবার

---

[১৫২] অসতস্বন্যেষু তদ্গামী হ্যর্থো ভবতি। বৌ. ধ. সূ. ১/৫/১১/৯

[১৫৩] সপিণ্ডাভাবে সকুল্যঃ। বৌ. ধ. সূ. ১/৫/১১/১০

[১৫৪] তদভাবে পিতাঽঽচার্যোঽন্তেবাস্যৃত্বিগ্বা হরেত্। বৌ. ধ. সূ. ১/৫/১১/১১

[১৫৫] তদভাবে রাজা সতস্বং ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধেভ্যঃ সংপ্রযচ্ছেত্। বৌ. ধ. সূ. ১/৫/১১/১২

[১৫৬] বি. ধ. সূ. ১৭/৪

[১৫৭] তদভাবে দুহিতৃগামি, বি. ধ. সূ. ১৭/৫

[১৫৮] তদভাবে পিতৃগামি। বি. ধ. সূ. ১৭/৬

[১৫৯] তদভাবে মাতৃগামি। বি. ধ. সূ. ১৭/৭

[১৬০] তদভাবে ভ্রাতৃগামি। বি. ধ. সূ. ১৭/৮

[১৬১] তদভাবে ভ্রাতৃপুত্রগামি। বি. ধ. সূ. ১৭/৯

উপযুক্ত সম্পর্কের আত্মীয়দের অনুপস্থিতি ঘটলে বন্ধু হবেন ওই ধনের অধিকারী।[১৬২] এক্ষেত্রে সকুল্য[১৬৩] এবং সহাধ্যায়ী[১৬৪] পূর্ববর্তীর অভাবে ওই ধনের অধিকারী হবেন। আবার সকলের অভাব হলে রাজা ওই ধনের অধিকারী হবেন।[১৬৫]

সম্পত্তিবিভাগ

আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের মত অনুসারে পিতার নিজের জীবনেই পুত্রদের সমান রূপে সম্পত্তির বিভাজন করে দেওয়া উচিত, কিন্তু নপুংসক, পাগল আর পাতকী পুত্রকে সম্পত্তির অংশ দেওয়া হবে না।[১৬৬] আবার পুত্রের অভাবে যিনি কাছের সপিণ্ড তিনি ওই সম্পত্তির অধিকারী হন।[১৬৭] সপিণ্ডের অভাবে সম্পত্তির অধিকারী হবেন আচার্য। আচার্য যদি না থাকেন তাহলে সম্পত্তির অধিকারী হবেন তাঁর শিষ্যরা, ওই শিষ্য উক্ত সম্পত্তি গ্রহণ করে মৃত ব্যক্তির নামে ধর্ম-কর্মে ওই ধনের ব্যবহার করবেন অথবা নিজেই ওই ধনের উপভোগ করবেন- ‘তদভাব আচার্য আচার্যাভাবেঽন্তেবাসী হৃত্বা তদর্থেষু ধর্মকৃত্যেষু বোপযোজয়েত্’।[১৬৮] সম্পত্তি বিভাজনের বিষয়ে *বৌধায়ন ধর্মসূত্র* অনুসারে পিতাকে তাঁর সম্পত্তি সকল পুত্রের মধ্যে বিশেষ ভাগ না দিয়ে, সকলকে সমান ভাগ দিয়ে বিভাজন করতে হবে।[১৬৯]

---

[১৬২] তদভাবে বন্ধুগামি। বি. ধ. সূ. ১৭/১০

[১৬৩] “তদভাবে সকুল্যগামি। বি. ধ. সূ. ১৭/১১

[১৬৪] তদভাবে সহাধ্যায়িগামি। বি. ধ. সূ. ১৭/১২

[১৬৫] তদভাবে ব্রাহ্মণধনবর্জং রাজগামি। বি. ধ. সূ. ১৭/১৩

[১৬৬] জীবন্ পুত্রেভ্যো দায়ং বিভজেত্ সমং ক্লীবমুন্মত্ত পতিতং চ পরিহাপ্য। আ. ধ. ২/৬/১৪/১

[১৬৭] পুত্রাভাবে যঃ প্রত্যাসন্নঃ সপিণ্ডঃ। আ. ধ. সূ. ২/৬/১৪/২

[১৬৮] আ. ধ. সূ. ২/৬/১৪/৩

[১৬৯] সমশস্সর্বেষামবিশেষাত্। বৌ. ধ. সূ. ২/২/৩/৩

অথবা শ্রেষ্ঠ পুত্র ওই সম্পত্তির সব থেকে উৎকৃষ্ট দ্রব্য নিজের বিশেষ ভাগ রূপে গ্রহণ করবেন।[১৭০] এছাড়াও বলা হয়েছে পিতা জীবিত থাকলে তাঁর অনুমতি অনুসারে সম্পত্তির বিভাজন করতে হবে।[১৭১] *বিষ্ণু ধর্মসূত্রে* পিতার দ্বারাই সম্পত্তি বিভাগের কথা উল্লেখ আছে। পিতা নিজের পুত্রদের মধ্যে নিজের সম্পত্তি তাঁর ইচ্ছানুসারে বিভাজন করবেন।[১৭২]

সম্পত্তি বিভাজনের বিষয়ে *গৌতম ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে- 'উর্দ্ধ্ব পিতুঃ পুত্রা রিক্থং ভজেরন্'।[১৭৩] অর্থাৎ পিতার মৃত্যুর পর পুত্র ওই সম্পত্তির অধিকারী হবেন। অথবা পিতার মৃত্যুর পরে মায়ের রজোদর্শন আয়ু সমাপ্ত হবার আগে ইচ্ছানুসারে বিভাজন করে দেওয়া হয়।[১৭৪]

আচার্য মনু বলেছেন যে- মাতাপিতার লোকান্তর হলে ভ্রাতৃবর্গ সকলে একত্র হয়ে পৈতৃক ধন সমভাগে বিভাগ করে নিতে পারেন, কিন্তু পিতা-মাতার জীবিত থাকা অবস্থায় পুত্রের সে ধনে কোনও অধিকার নেই।[১৭৫] এছাড়া তিনি আরও বলেছেন, যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা অতিধার্মিক এবং অন্যান্য সকল ভাইয়ের একত্র বাস করার অভিলাষ আছে, সে ক্ষেত্রে বিভাগ না করে রক্ষণাবেক্ষণার্থে পিতার সম্পূর্ণ ধন তিনিই গ্রহণ করবেন। সেক্ষেত্রে অন্য ভ্রাতৃবর্গ তাঁর অধীনে আসবেন, যেমনভাবে

---

[১৭০] বরং বা রূপমুদ্ধরেজ্জ্যেষ্টঃ। বৌ. ধ. সূ. ২/২/৩/৪

[১৭১] পিতুরনুমত্যা দাযবিভাগস্সতি পিতরি। বৌ. ধ. সূ. ২/২/৩/৮

[১৭২] পিতা চেপ্তুত্রাব্নিভজেত্তস্য স্বেচ্ছা স্বযমুপার্জিতেহর্থে। বি. ধ. সূ. ১৭/১

[১৭৩] গৌ. ধ. সূ. ৩/১০/১

[১৭৪] নিবৃত্তে রজসি মাতুর্জিবতি চেচ্ছতি। গৌ. ধ. সূ. ৩/১০/৩

[১৭৫] উর্দ্ধঃ পিতৃশ্চ মাতুশ্চ সমেত্য ভ্রাতরঃ সমম্।

ভজেরণ্ পৈতৃকং বিক্.থমনীশাস্তে হি জীবতোঃ।। মনু. ৯/১০৪

তাঁরা পিতার অধীনে বাস করতেন।[১৭৬] যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, যদি পিতা সম্পত্তির বিভাগ করেন তাহলে তিনি নিজের ইচ্ছানুসারে পুত্রদের মধ্যে সম্পত্তির বিভাগ করবেন। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে শ্রেষ্ঠ ভাগ দিয়ে বিভাজন করবেন অথবা সকল পুত্রকে সমান অংশ দেবেন।[১৭৭]

৩.২.৮- নারীর সামাজিক অবস্থান- নারীর মর্যাদা

ধর্মসূত্রে নারীর যে অবস্থান দেখতে পাওয়া যায় সেখানে একরূপতার পূর্ণ আভাস পাওয়া যায় না। সেখানে নারী কোথাও বিশেষ সম্মানের অধিকারী, কোথাও আবার শূদ্রবর্ণের সমগোত্রীয়। স্ত্রী বিষয়ে আলোচনা প্রায় সব ধর্মসূত্রেই করা হয়েছে। স্ত্রীধর্মের বিবেচনে কিছু কিছু ধর্মসূত্রে পৃথক অধ্যায়ও পাওয়া যায়। যেমন *গৌতম ধর্মসূত্রের* দ্বিতীয় প্রশ্নের নবম অধ্যায়, *বসিষ্ঠ ধর্মসূত্রের* পঞ্চম অধ্যায়, *বিষ্ণু ধর্মসূত্রের* পঁচিশ ও ছাব্বিশতম অধ্যায় এবং *বৌধায়ন ধর্মসূত্রের* দ্বিতীয় প্রশ্নের দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্ত্রীধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও ধর্মসূত্রের অনেক প্রসঙ্গে স্ত্রীবিষয়ক যে সব নিয়ম-কানুন বলা আছে, সেখান থেকেও আমরা তৎকালীন ভারতে নারীর অবস্থান কী ছিল তার অনেক প্রমাণ লাভ করতে পারি। সকল প্রকার অবস্থায় স্বামীর অনুকূল এবং অধীনে থাকাই হল ধর্মসূত্রের দৃষ্টিতে নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম। *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে স্ত্রী কখনই স্বতন্ত্র নন, প্রত্যেক স্ত্রীই পুরুষের কাছে

---

[১৭৬] জ্যেষ্ঠ এবং তু গৃহ্ণীয়াৎ পিত্র্যং ধনমশেষতঃ।

শেষাস্তমুপজীবেয়ুর্যথৈব পিতরং তথা।। মনু. ৯/১০৫

[১৭৭] বিভাগং চেত্পিতা কুর্যাদিচ্ছয়া বিভজেস্তুতান্।

জ্যেষ্টং বা শ্রেষ্ট ভাগেন সর্বে বা স্যুঃ সমাংশিনঃ।। যজ্ঞ. ২/১১৪

আশ্রিত।[১৭৮] এছাড়াও বলা হয়েছে, নারীকে কুমারী অবস্থায় পিতা রক্ষা করবেন, বিবাহোত্তর অবস্থায় স্বামী রক্ষা করবেন এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র রক্ষা করবেন। অতএব নারী কখনওই স্বতন্ত্র নন।[১৭৯]

---

[১৭৮] ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যং বিদন্তে। বৌ. ধ. সূ. ২/২/৩/৪৫

[১৭৯] পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
 পুত্রস্তু স্থাবিরে ভাবে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতীতি।। বৌ. ধ. সূ. ২/২/৩/৪৬

চতুর্থ অধ্যায়

যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক বিবরণ

চতুর্থ অধ্যায়

যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক বিবরণ

৪.১- শিক্ষাব্যবস্থা

বৈদিক যুগের আশ্রমভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা মূলত গুরু এবং শিষ্য পরম্পরায় প্রচলিত ছিল। পরবর্তী সূত্রগ্রন্থে শিক্ষাবিষয়ে আরও অধিক বিস্তৃত ধারণা পাওয়া যায়। ব্রহ্মাচর্য আশ্রম শিক্ষার জন্য বিহিত ছিল। মনুষ্যজীবনে বিশেষ করে সামাজিক জীবনে এই স্তরটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যা তৎকালীন যুগের মুনি-ঋষিরা বিশেষভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

৪.১.১- পাঠ্যবিষয়

বৈদিক যুগে গুরুকুলভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। এর জন্য শিক্ষার্থীকে গুরুগৃহে থেকে পড়াশোনা করতে হত। উপনয়ন-কর্মের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিক্ষার সূত্রপাত হত। শিক্ষালাভের জন্য শিক্ষার্থীকে কোনও প্রকার অর্থ প্রদান করতে হত না। বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থায় গুরু ও শিক্ষকের সম্পর্ক ছিল পিতা ও পুত্রের মতো। গুরু পরম স্নেহে শিষ্যকে শিক্ষাদান করতেন। শিক্ষা সমাপনান্তে শিক্ষার্থীকে স্নান করানো হত এবং তিনি স্নাতক বলে অভিহিত হতেন। এই অনুষ্ঠানটিকে সমাবর্তন বলা হয়। শিক্ষার্থীকে প্রত্যহ বেদপাঠ করতে হত। প্রত্যহ বেদপাঠ করাকে স্বাধ্যায় বলা হয়। এই স্বাধ্যায় ছিল নিত্যকর্ম। প্রতিদিন শিক্ষার্থীকে সূর্যাস্তের পূর্বে ও গুরুর শয্যাত্যাগের পূর্বে শুচিতাপূর্বক পূর্ব বা উত্তরমুখী হয়ে সাবিত্রী মন্ত্র পাঠ করতে হত। ঠিক একই ভাবে সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পর সাবিত্রী মন্ত্র পাঠ করতে হত। যাঁদের সঠিক

সময়ে উপনয়ন হত না, তাঁরা সাবিত্রী কর্ম থেকে বিচ্যুত হতেন। এঁদেরকে পতিত সাবিত্রী বলা হত। সাবিত্রী কর্ম থেকে বিচ্যুত ব্যক্তিগণ সমাজচ্যুত হতেন। এরকম ব্যক্তিগণ 'ব্রাত্যস্তোম' নামক যজ্ঞকর্ম দ্বারা বেদপাঠের অধিকারী হতেন। 'স্বাধ্যায়' বৈদিক শিক্ষার্থীর নিত্যপাঠ্য বিষয় হলেও পরবর্তীকালে পাঠ্যবিষয় বৃদ্ধি পায়। যিনি ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করতেন তিনি স্নাতক হতেন, আর যিনি কেবলমাত্র যজ্ঞবিষয়ে অধ্যয়ন করতেন তাঁর সমাবর্তন অনুষ্ঠান হত না। এ থেকে বোঝা যায় বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ছিল। আচার্য শিক্ষার্থীর ধারণ-ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা প্রদান করতেন।

শতপথব্রাহ্মণের সম্পূর্ণ ষষ্ঠ ভাগটি বেদপাঠের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উপদেশ ও উচ্চ প্রশংসায় পূর্ণ। *শতপথব্রাহ্মণে* বেদ ছাড়া অন্যান্য পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধেও উল্লেখ আছে। এই বিষয়গুলির মধ্যে বেদের নিয়মপ্রণালী, বিজ্ঞান, কথোপকথন, প্রচলিত কাহিনি ও কিংবদন্তী, মনুষ্যের কীর্তি সম্বন্ধে ছন্দোবদ্ধ বাক্য ইত্যাদি প্রধান। এছাড়াও *শতপথব্রাহ্মণে* সর্পবিদ্যা, রাক্ষসবিদ্যা এবং সভ্যসমাজে অপ্রচলিত অথচ নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই প্রচলিত অসুর-বিদ্যার উল্লেখ রয়েছে।[১] বছরের পর বছর নতুন নতুন বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করায় পাঠ্যবিষয় ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এ প্রসঙ্গে *ছান্দোগ্য উপনিষদে* বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।[২] এখানে নারদ তাঁর আচার্য সনৎকুমারের নিকট নারদের অধীত যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করেছিলেন তার তালিকা পাওয়া যায়। এই তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি হল- চারটি বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, পিতৃলোকের সন্তুষ্টিসাধনে করণীয় নিয়মাবলী, অঙ্ক বা রাশিশাস্ত্র, দৈববিদ্যা,

---

[১] শ. ব্রা. ১৩/৪-৩

[২] ছা. উ. ৭/১/২

নিধিবিদ্যা, তর্কবিদ্যা, তত্ত্বালোচনা, আচার-ব্যবহার প্রণালী, দেববিদ্যা বা ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান, বেদের আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় বা ব্রহ্মবিদ্যা, পদার্থ ও শারীরবিদ্যা, রাজনীতি ও শাসন প্রণালী, জ্যোতির্বিদ্যা, সরীসৃপ ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান বা সর্পবিদ্যা এবং দেবজনবিদ্যা।

৪.১.২- আচার্য

আচার্য পদটি 'আঙ্' উপসর্গ পূর্বক √ চর্ ধাতু যোগে ণ্যত্ প্রত্যয় করে সম্পন্ন হয়। নিরুক্তকার যাস্কের মতে 'আচার্য আচারং গ্রাহয়তি, আচিনোত্যর্থান্ আচিনোতি বুদ্ধিমিতি'।[৩] নিরুক্তকার আচার্য পদটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করেছেন এবং একাধিক নির্বচন উপস্থিত করেছেন। প্রথমটি হল- আচারং গ্রাহয়তি- আ- √ চর্ + ঘ্যণ্ = আচার্য। অর্থাৎ যিনি শিষ্যগণকে আচরণ বিধি বিষয়ে শিক্ষাদান করেন। দ্বিতীয় নির্বচন হল- আচিনোতি অর্থান্- আ- √ চি্ এর উত্তর উণাদি প্রত্যয় অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রার্থ শিষ্যের নিমিত্ত চয়ন বা সংগ্রহ করেন। তৃতীয় নির্বচন- আচিনোতি বুদ্ধিম্। এখানেও আ পূর্বক √চিধাতুর যোগে আচার্য্য শব্দ নিষ্পন্ন, অর্থ- যিনি শিষ্যের নিমিত্ত বুদ্ধি বা জ্ঞান চয়ন করেন বা বুদ্ধির বিকাশ সাধন করেন।[৪] *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে* আচার্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে- আচার্য হলেন তিনিই, যাঁর মাধ্যমে উপনীত বালক ধর্মের জ্ঞান লাভ করে।[৫] *বিষ্ণু ধর্মসূত্রের* মত অনুসারে উপনয়ন করে, যিনি ব্রতের উপদেশ দিয়ে বেদ এবং বেদাঙ্গের অধ্যয়ন করেন তাকে আচার্য বলা হয়।[৬]

---

[৩] নিরু. ১/২

[৪] নিরু. ১/২ বিবৃতি

[৫] যস্মাদ্ধর্মানাচিনোতি স আচার্যঃ। আ. ধ. সূ. ১/১/১/১৪

[৬] যস্তুপনীয় ব্রতাদেশং কৃত্বা বেদমধ্যাপয়েত্তমাচার্য বিদ্যত্। বি. ধ. সূ. ২৯/১

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, যে ব্রাহ্মণ উপনয়ন দিয়ে শিষ্যকে কল্প ও রহস্যের সঙ্গে সমগ্র বেদশাস্ত্র অধ্যাপনা করেন, তাঁকে মুনিগণ আচার্য নামে অভিহিত করেন।[৭]

৪.১.৩- সংস্কারসমূহ

সংস্কার শব্দটির ব্যুৎপত্তি এরূপ- সম্ উপসর্গপূর্বক 'কৃ' ধাতুর সঙ্গে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করে 'সম্পরিভ্যাং করোতৌ ভূষণে'[৮] পাণিনির এই সূত্র দ্বারা ভূষণ অর্থে 'সুট্' আগমে সংস্কার শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। সংস্কারের সংখ্যা বিষয়ে ধর্মসূত্র ও গৃহ্যসূত্রে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়।

আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে উপনয়ন, বেদারম্ভ, সমাবর্তন, বিবাহ তথা অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতি সংস্কার বিষয়ক বর্ণনাই মুখ্য হয়ে উঠেছে।[৯] *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* উপনয়ন, বিবাহ এবং বেদাধ্যয়ন এই সংস্কারগুলির বর্ণনা পাওয়া যায়।[১০]

গৌতম ধর্মসূত্রে চল্লিশটি সংস্কারের নাম উল্লেখ রয়েছে। সেগুলি হল- গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চৌল, উপনয়ন;[১১] চারটি ব্রত (মহানাম্নীব্রত, উপনিষদব্রত, মহাব্রত, গোদান);[১২] স্নান, বিবাহ; পাঁচটি মহাযজ্ঞ (দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ এবং ব্রহ্মযজ্ঞ);[১৩] সাতটি পাকযজ্ঞ

---

[৭] উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্যং প্রচক্ষতে।। মনু. ২/১৪০

[৮] লঘু. সি. কৌ. ৬/১/১৩৭

[৯] আ. ধ. সূ. ১/১/১/৯, ১/২/৫/২, ১/২/৮/১, ২/৫/১১/১৫, ২/৬/১৫/২

[১০] বৌ. ধ. সূ. ১/২/৩/৮, ১/১১/২০/১

[১১] গর্ভাধানপুংসবনসীমন্তোন্নয়ন জাতকর্মনামকরণান্নপ্রাশন চৌলোপনয়ন। গৌ. ধ. সূ. ১/৮/১৪

[১২] চত্বারি বেদব্রতানি। গৌ. ধ. সূ. ১/৮/১৫

[১৩] স্নানং সহধর্মচারিণী সংযোগে। গৌ. ধ. সূ. ১/৮/১৬

(অষ্টকা, পার্বণস্থালীপাক, শ্রাদ্ধ, শ্রাবণী, আগ্রহায়ণী, চৈত্রী, আশ্বযুজী);[১৪] সাতটি হবির্যজ্ঞ (অগ্ন্যাধান, অগ্নিহোম, দর্শপৌর্ণমাস, আগ্রয়ণ, চাতুর্মাস্য, নিরূঢ়পশুবন্ধ, সৌত্রামণী);[১৫] এবং সাতটি সোমযজ্ঞ সংস্থা (অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্‌থ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র, অপ্তোর্যাম)।[১৬] *গৌতম ধর্মসূত্রে* এই চল্লিশটি সংস্কারের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৭]

মনুসংহিতায় গর্ভাধান থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তেরটি সংস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৮] যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতেও কেশান্তরকে ছেড়ে মনুর মতোই একই সংস্কারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।[১৯]

পি ভি কাণে মহাশয় তাঁর গ্রন্থে সংস্কারের ষোল প্রকার ভেদের কথা বলেছেন। সেগুলি হল- গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, বিষ্ণুবলি, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চৌল, উপনয়ন, বেদব্রতচতুষ্টয়, সমাবর্তন এবং বিবাহ।[২০]

পঞ্চানাং যজ্ঞানামনুষ্ঠানং দেবপিতৃমনুষ্য ভূত ব্রাহ্মণাম্। গৌ. ধ. সূ. ১/৮/১৭

[১৪] অষ্টকা পার্বণঃ শ্রাদ্ধং শ্রাবণ্যাগ্রহায়ণী চৈত্র্যাশ্বযুজীতি সপ্তপাকযজ্ঞ সংস্থাঃ। গৌ. ধ. সূ. ১/৮/১৮

[১৫] অগ্যাধেযমাগ্নিহোত্রং দর্শপূর্ণমাসাবাগ্রযণং চাতুর্মাস্যানি নিরূদপশুবন্ধঃ সৌত্রামণীতি সপ্ত হবির্যজ্ঞ সংস্থাঃ। গৌ. ধ. সূ. ১/৮/২০

[১৬] অগ্নিষ্টোমোঽত্যগ্নিষ্টোম উকথ্যষোড়শী বাজপেযোঽতিরাত্রেঽপ্তোর্যাম ইতি সপ্ত সোমযজ্ঞ সংস্থা। গৌ. ধ. সূ. ১/৮/২১

[১৭] ইত্যেতে চত্বারিংশস্তংস্কারাঃ। সংস্থাঃ। গৌ. ধ. সূ. ১/৮/২২

[১৮] মনু. ২/২৬, ২/২৯, ২/৩০, ২/৩৪, ২/৩৫, ২/৩৬, ২/৬৫, ৩/4, ৩/৪৩

[১৯] যাজ্ঞ. ১/১১, ১/১২, ১/৫১-৬১, ১/২১৭

[২০] ধর্ম. শা. ইতিহাস, প্রথম ভাগ, পৃ- ১৭৮

শিক্ষাসংস্কার-

শিক্ষার শুরুই হত বেদারম্ভ এবং উপনয়ন সংস্কারের মাধ্যমে এবং বিদ্যা অর্জনের পরে সমাবর্তন সংস্কার পালন করার বিধান আছে। শিক্ষার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত উপনয়ন ও সমাবর্তন সংস্কার সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হল।

উপনয়ন-

উপনয়ন হল শিক্ষাসংক্রান্ত সংস্কার। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে এই সংস্কারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বাল্যাবস্থায় গুরুগৃহে বাস করে শিক্ষালাভ করতে হত, যা ব্রহ্মচর্যাশ্রম হিসেবে চিহ্নিত। উপনয়ন সংস্কারের মধ্য দিয়েই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রবেশের অনুমতি মিলত। উপনয়ন শব্দ উপ উপসর্গপূর্বক 'নি' ধাতুর সঙ্গে ল্যুট্ প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়। উপ শব্দের অর্থ হল সমীপে এবং 'নয়ন' শব্দের অর্থ হল আনয়ন করা। সে সংস্কারের দ্বারা বালককে বেদাধ্যয়নের জন্য গুরুর সমীপে আনয়ন করা হয় সেই সংস্কারকে উপনয়ন সংস্কার বলা হয়। উপনয়ন সংস্কারের মাধ্যমেই ব্রহ্মচারী প্রথম আচার্যের সাহচর্য লাভ করে। প্রত্যেক ধর্মসূত্রে উপনয়ন সংস্কারের জন্য আলাদা আলাদা ঋতুর বিধান দেওয়া রয়েছে। *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে- 'বসন্তে ব্রাহ্মণমুপনযীত, গ্রীষ্মে রাজন্যং, শরদি বৈশ্যং'।[২১] অর্থাৎ বসন্ত ঋতুতে ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়ন করার কথা বলা হয়েছে, গ্রীষ্ম ঋতুতে ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন এবং শরৎ ঋতুতে বৈশ্যের উপনয়ন সংস্কার করার কথা বলা হয়েছে। তেমনি আবার উপনয়ন সংস্কারের ঋতু নির্ধারণের সম্বন্ধে *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে যে বর্ণক্রমানুসারে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) উপনয়ন বসন্ত, গ্রীষ্ম আর শরৎ ঋতুতে

---

[২১] আ. ধ. সূ. ১/১/১/১৯

করণীয়।[২২] ধর্মসূত্রে ঋতুর উল্লেখ যেমন আমরা পাই, তেমনি আবার সময়সীমারও উল্লেখ আমরা দেখতে পাই। *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে* ব্রাহ্মণ বর্ণের উপনয়নের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে গর্ভকাল থেকে আট বছর সময় অবধি। তেমনি ক্ষত্রিয়দের জন্যেও স্বতন্ত্র সময় বিধানের উল্লেখ রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ক্ষত্রিয়দের জন্য নির্ধারিত সময় হবে ব্রাহ্মণদের থেকে তিন বছর অধিক। অর্থাৎ গর্ভকাল থেকে এগারো বছর অবধি। অন্যদিকে আবার বৈশ্যের জন্য সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষা আরও এক বছর বেশি। আর্থাৎ বৈশ্যেরা এক্ষেত্রে সময় পাবে গর্ভকাল থেকে বারো বছর অবধি।[২৩] *বৌধায়ন ধর্মসূত্রেও* আমরা এই একই বিধানের প্রসঙ্গকে খুঁজে পাই।[২৪] যদি কোনও কারণে নির্ধারিত সময়ে উপনয়ন না করা হয়, তাহলে ব্রাহ্মণের ষোল বছরে, ক্ষত্রিয়ের বাইশ বছরে এবং বৈশ্যের চব্বিশ বছরের মধ্যে উপনয়ন সংস্কার সম্পূর্ণ করতে হবে বলে বলা হয়েছে।[২৫]

গৌতম ধর্মসূত্রের মতে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয় কুমারের উপনয়ন সংস্কারের অতিরিক্ত কাল হল যথাক্রমে ষোল, বাইশ এবং চব্বিশ বছর।[২৬]
ধর্মসূত্রকারের মত অনুসারেই মনু[২৭] ও যাজ্ঞবল্ক্যও[২৮] উপনয়নের জন্য আয়ুর বিচারে নির্দিষ্ট বিভাগ করবার কথা বিধান হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

---

[২২] বসন্তো গ্রীষ্মশরদিত্যৃতবো বর্ণানুপূর্ব্যেণ। বৌ. ধ. সূ. ১/২/৩/১১

[২৩] গর্ভাষ্টমেষু ব্রাহ্মণং, গর্ভৈকাদশেষু রাজন্যং, গর্ভদ্বাদশেষু বৈশ্যম্। আ.ধ.সূ. ১/১/১/১৯

[২৪] গর্ভাদিস্সঙ্খ্যা বর্ষাণাং তদষ্টমেষু ব্রাহ্মণমুপনয়েত্। বৌ. ধ. সূ. ১/১/৩/৮

ত্র্যধিকেষু রাজন্যমুপনযীত। বৌ. ধ. সূ. ১/১/৩/৯

তস্মাদেকাধিকেষু বৈশ্যম্। বৌ. ধ. সূ. ১/১/৩/১০

[২৫] আষোড়শাদাদ্বাবিংশাদাচতুর্বিংশাদিত্যনাত্যয় এষাং ক্রমেণ। বৌ.ধ.সূ. ১/২/৩/১৩

[২৬] গৌ. ধ. সূ. ১/১/১৩/১৪

সমাবর্তন-

সমাবর্তন শব্দটি “সম-আ” উপসর্গপূর্বক “বৃৎ” ধাতুর সঙ্গে ‘ল্যুট্’ প্রত্যয় যুক্ত করে নিষ্পন্ন হয়েছে। যার অর্থ হল প্রত্যাবর্তন হওয়া বা ফিরে আসা। বেদ অধ্যয়ন সমাপ্ত করে গুরুগৃহ থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে এই সংস্কারটি অনুষ্ঠেয়। এই সংস্কার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গুরুগৃহে কোনও শিক্ষার্থীর, শিক্ষার সমাপ্তি সূচিত হয়। এরপর সেই শিক্ষার্থী দ্বিজ সমাজের একজন প্রতিনিধি হয়ে পারিবারিক দায় এবং দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়ে উঠে। বেদ অধ্যয়নের সমাপ্তিসূচক এই সংস্কারটিকে ‘সমাবর্তন’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যয়নের সমাপ্তি হলে আচার্যের অনুমতি সাপেক্ষে বিধি পূর্বক স্নান করার মধ্য দিয়েই এই ‘সমাবর্তন’ সংস্কারটি অনুষ্ঠিত হয় বলে এই সংস্কারকে ‘স্নান’ বলেও কোনও কোনও শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৯]

বর্তমানে ‘সমাবর্তন’ নামক এই অনুষ্ঠানটি উপনয়নের সঙ্গেই সেরে ফেলা হয়। সময় বদলের সাপেক্ষে এই নানাবিধ বিধানগুলিরও পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। এখন গুরুগৃহে বাস করে বিদ্যাচর্চার তেমন সুযোগ নেই। তাই এই সংস্কারও তার পূর্বের তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছে যুগ বদলের সঙ্গে সঙ্গে। বর্তমানে মহাবিদ্যালয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম ও তৎসংশ্লিষ্ট ডিগ্রীর সঙ্গে ‘স্নাতক’ ও ‘স্নাতকোত্তর’ শব্দদুটি ব্যবহৃত হয় এবং উপাধি দানের অনুষ্ঠান করা হয়, তা ‘সমাবর্তন’ নামেই পরিচিতি লাভ করেছে।

---

[২৭] গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্বীত ব্রহ্মণস্যোপনয়নম্।
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ।। মনু. ২/৩৬

[২৮] গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাঽব্দে ব্রহ্মণস্যোপনায়নম্।
রাজ্ঞামেকাদশে সৈকে বিশামেকে যথাকুলম।। যাজ্ঞ. ১/১৪

[২৯] গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি। মনু. ৩/৪

৪.২- স্বাস্থ্যব্যবস্থা

স্বাস্থ্যই সম্পদ, তাই সেই সম্পদ রক্ষায় সকলেরই যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। সাধারণত শারীরিক ও মানসিক সুস্থতাকে স্বাস্থ্য বলে। দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্য-সচেতনতার মূলে পানীয় জলের ভূমিকা খুব উল্লেখযোগ্য। *অথর্ববেদে* বলা হয়েছে জলই রোগের বংশকে নষ্ট করে।[৩০] স্বাস্থ্যবিধি বলতে পরিস্রুত পানীয় জল পান করা, খাবারের আগে ও পরে হাত মুখ পরিষ্কার করে ধোয়া প্রভৃতিকে বোঝায়। শরীরকে সুস্থ রাখতে নিত্যকর্মের ক্ষেত্রে সচেতনমূলক বিধানগুলি প্রাচীনকালেও বিভিন্নভাবে অনুসৃত হত। *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে, মনুসংহিতায়, অথর্ববেদে* উল্লিখিত বিধানগুলির প্রমাণ আমরা পাই। জল মানুষকে জীবন প্রদান করে তাই জলের অপর নাম জীবন। জল ছাড়া মনুষ্য জীবন রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই এই পানীয় জল পরিশুদ্ধ হওয়া খুব জরুরি। কারণ জলই হল সকল রোগের ঔষধ। *মনুসংহিতার* চতুর্থ অধ্যায়ে পানীয় জলের বিষয়ে সচেতনমূলক মনোভাব দৃষ্ট হয়। সেখানে বলা হয়েছে, যে পুষ্করিণী, দীঘি প্রভৃতি জলাশয়ের জল পান করার জন্য নির্দিষ্ট, সেই সমস্ত জলাশয়ে স্নানাদি কর্ম করা যাবে না।[৩১] পরিষ্কার জলপান যেমন দেহকে সুস্থ রাখে, তেমনি হাত পা প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাও দৈহিক সুস্থতার জন্য অপরিহার্য। তাই *মনুসংহিতায়* গ্রন্থকার ভোজন পূর্ব স্নানাদির মাধ্যমে দৈহিক পরিশুদ্ধতার নির্দেশ দিয়েছেন।[৩২]

---

[৩০] অথর্ববেদ. ৩/৭/৫

[৩১] পরকীয়নিপানেষু ন স্নায়াচ্চ কদাচন।
নিপানকর্তুঃ স্নাত্বা তু দুষ্কৃতাংশেন লিপ্যতে।। মনু. ৪/২০১

[৩২] ন স্নানমাচরেদ্ভুক্তা। ৪/১২৯

৪.২.১- ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য

ভক্ষ

আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে- 'তৈলমর্পিষী তূপযোজযেদুদকেঽবধায়'।[৩৩] অর্থাৎ বাজার থেকে কিনে আনা তেল এবং ঘি সামান্য জল ছিটিয়ে শুদ্ধ করলে তবে তা হয় গ্রহণের যোগ্য। এক খুরবিশিষ্ট কোনও পশু, উট কিংবা গ্রাম্য শুয়োরের মাংস খাওয়া যাবে না।[৩৪] এছাড়াও বলা হয়েছে যে বাজার থেকে কিনে আনা অথবা বাজার থেকে বানানো খাবার খাওয়া যাবে না- 'নাঽঽপণীযমৎন্নমশ্নীযাত্'।[৩৫] তেমনি আমরা *বৌধায়ন ধর্মসূত্রেও* কিছু বিধান দেখতে পাই। সেখানে বলা হয়েছে খরগোশ, শল্যক কিংবা কচ্ছপের মতো প্রাণীদের মাংস ভক্ষণ করা যেতে পারে। এছাড়াও অতিরিক্ত খড়্গ ছাড়া পাঁচ নখবিশিষ্ট পশুকে ভক্ষণ করার বিধান দেওয়া হয়েছে উক্ত ধর্মসূত্রে। এই রকমই কালো রঙের হরিণকে ছেড়ে সাদা খুর-যুক্ত হরিণ (নীলগাই), সামান্য হরিণ, মোটা বা পুরু চামড়া-যুক্ত হরিণ, মহিষ, বন্য শুয়োর, পাঁচ বা দুই খুর-যুক্ত পশু ভক্ষণ করবার বিধান দেওয়া আছে। 'তথর্শ্যহরিণপৃষতমহিষবরাহ কুলুঙ্গাঃ কুলুঙ্গবর্জাঃ পঞ্চদ্বিখুরিণঃ'।[৩৬] এই ধর্মসূত্রে আরও বলা হয়েছে- তিত্তির, পায়রা কপিঞ্জল, বার্ধ্রাণস, আর ময়ূর এই পাঁচটি পাখি, যারা নিজের ঠোঁট দিয়ে, ছিঁড়ে খাবার গ্রহণ করে, সেই সকল পাখিও ভক্ষণ করা যাবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৩৩] আ. ধ. সূ. ১/৫/১৭/১৬

[৩৪] একখুরোষ্ট্রগবযগ্রামসূকরশরভগবাম্। আ. ধ. সূ. ১/৫/১৭/২৯

[৩৫] আ. ধ. সূ. ১/৫/১৭/১৪

[৩৬] বৌ. ধ. সূ. ১/৫/১২/৬

তাই বলা হয়েছে- 'পক্ষিণস্তিত্তিরিকপোতকপিঞ্জলবার্ধ্রাণসময়ূরবারণা বারণবর্জাঃ পঞ্চ বিবিষ্কিরাঃ'।[৩৭]

অন্যদিকে, *গৌতম ধর্মসূত্রের* মত অনুসারে, যে মাছ বিকৃত স্বরূপ নয়, সেই জাতীয় মাছ ভক্ষণ করা যেতে পারে।[৩৮]

ভক্ষ প্রসঙ্গে আচার্য মনু বলেছেন, মাছের মধ্যে পাঠীন অর্থাৎ বোয়াল মাছ এবং রোহিত (রুই মাছ), রাজীব (যে মাছের গায়ে ডোরাকাটা দাগ থাকে), সিংহতুণ্ড (যে মাছের মুখের আকৃতি সিংহের মতো) এবং শল্ক অর্থাৎ আঁশ-বিশিষ্ট সকল মাছ 'হব্য' এবং 'কব্য' অর্থাৎ দেবকার্যে ও পিতৃকার্যে নিবেদন করা হয় কর্মশেষে তা খাওয়া যাবে।[৩৯] এছাড়াও তিনি আরও বলেছেন যে, পঞ্চনখ প্রাণীদের মধ্যে শ্বাবিধ (শজারু), শল্যক (শজারুসদৃশ স্থূললোমযুক্ত প্রাণী), গোধা অর্থাৎ গোসাপ, গণ্ডার, কূর্ম (কচ্ছপ), শশক (খরগোশ)- এই ছয়টি প্রাণী ভোজন করা যাবে। এক পাটি দাঁতবিশিষ্ট পশুদের মধ্যে উট ছাড়া অন্যান্য প্রাণীদের (যথা গরু, মোষ, ছাগল,হরিণ) মাংস ভোজ্যরূপে গ্রহণ করা যায়।[৪০] *যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে* বলা হয়েছে-

'অন্নং পর্যুষিতং ভোজ্যং স্নেহাক্তং চিরসংস্থিতম্।

[৩৭] বৌ. ধ. সূ. ১/৫/১২/৭

[৩৮] মত্স্যাশ্চাবিকৃতাঃ। গৌ. ধ. সূ. ২/৮/৩৬

[৩৯] পাঠীনরোহিতাবাদ্যৌ নিযুক্তৌ হব্যকব্যয়োঃ।
রাজীবান্ সিংহতুণ্ডাংশ্চ সশল্কাংশ্চৈব সর্বশঃ।। মনু. ৫/১৬

[৪০] শ্বাবিধং শল্যকং গোধং খড়গকূর্মশশাংস্তথা।
ভক্ষান্ পঞ্চনখেষ্বাহুরনুষ্ট্রাংশ্চৈকভোদতঃ।। মনু. ৫/১৮

অস্নেহাং অপি গোধূমযবগোরসবিক্রিয়াঃ'।।[৪১]

অর্থাৎ ঘি-তেল দিয়ে তৈরি কিছু যেমন মালপোয়া অনেক সময় থেকে রাখা থাকলে এবং সেটি বাসি হলেও খাদ্য হিসেবে গ্রহণীয়। যব, গম ও দুধ থেকে প্রস্তুত দ্রব্য ভোজ্য ঘৃতাদি ও স্নেহযুক্ত না হলেও গ্রহণযোগ্য বলে ধরা হয়।

অভক্ষ্য

আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের মত অনুসারে এক খুরবিশিষ্ট কোনও পশু, উট, গবয়, গ্রাম্য শুয়োর প্রভৃতির মাংস খাওয়া যাবে না।[৪২] এছাড়াও আমরা দেখি, উক্ত ধর্মসূত্রেই বলা হয়েছে যে- 'নাঽঽপণীয়মত্রমশ্নীযাত্'। অর্থাৎ বাজার থেকে কিনে আনা অথবা বাজার থেকে বানিয়ে আনা কোনও খাবার খাওয়া যাবে না।[৪৩] বৌধায়ন ধর্মসূত্রকারের মত অনুসারে গ্রামের পালিত পশুও অভক্ষ্য অর্থাৎ খাওয়া পুরোপুরি নিষিদ্ধ।[৪৪] এছাড়াও গ্রামের কুকুট আর শূয়োরের মাংস অভক্ষ্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৫] টক হয়ে যাওয়া খাবার ভোজনের অনুপযোগ্য।[৪৬] টক হয়ে যাওয়া গুড়ও অভক্ষ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে উক্ত ধর্মসূত্রে।[৪৭]

---

[৪১] যজ্ঞ. ১/১৬৯

[৪২] একখুরোষ্ট্রগবযগ্রামসূকরশরভগবাম্। আ. ধ. সূ. ১/৫/১৬/২৯

[৪৩] আ. ধ. সূ. ১/৫/১৭/৪

[৪৪] অভক্ষ্যাঃ পশবো গ্রাম্যাঃ। বৌ. ধ. সূ. ১/৫/১২/১

[৪৫] তথা কুকুটসূকরম্। বৌ. ধ. সূ. ১/৫/১২/৩

[৪৬] শুক্তানি। বৌ. ধ. সূ. ১/৫/১২/১৫

[৪৭] তথাজাতো গুড়ঃ। বৌ. ধ. সূ. ২/৫/১২/১৬

গৌতম ধর্মসূত্রের মত অনুসারে, প্রতিদিন অপর জনের দেওয়া ভোজ্যবস্তু খাওয়া যাবে না।[৪৮] বাসি খাবার ভোজন করা উচিত নয়।[৪৯] আর যে খাবারে পোকা পড়েছে অথবা চুল পড়েছে সেই ধরনের খাদ্যবস্তু খাবার যোগ্য নয়।[৫০]

মনুর মত অনুসারে, কলবিঙ্ক (চড়ুই), প্লব, হাঁস, চক্রবাক, গ্রাম্যকুক্কুট, সারস, রজ্জুবাল, দাত্যূহ (ডাক) শুক-সারিকা (অর্থাৎ চিয়া ও শালিকা) এই সকল পাখি ভক্ষণের যোগ্য নয়।[৫১] এছাড়াও এক-চর প্রাণী (যেমন সাপ, পেঁচা প্রভৃতি) এবং অজানা মৃগ (অর্থাৎ পশু) ও পাখি ভক্ষণ করা উচিৎ নয়। আবার সামান্য ও বিশেষ রূপে নিষেধ না থাকায় পাঁচ নখ-যুক্ত প্রাণীও (যাদের পাঁচটি নখ আছে, যেমন, বানর, শৃগাল প্রভৃতি) ভক্ষণ করা উচিত নয় বলেই উল্লেখ রয়েছে।[৫২] *যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে* বলা হয়েছে -

'ক্রব্যাদপক্ষিদাত্যুহশুকপ্রতুদটিট্টিভান্।

সারসৈকশফান্হংসান্সর্বাংশ্চ গ্রামবাসিনঃ'।। [৫৩]

অর্থাৎ কাঁচা মাংস ভক্ষণ করা পক্ষী- চিল-শকুন, যে সব পাখি ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে খায় যেমন- চাতক, তোতা, বাজ, একখুর বিশিষ্ট পশু, হাঁস অথবা গ্রামে বসবাসকারী সব পাখির মাংস খাদ্যরূপে বর্জন করার কথা বলা হয়েছে।

---

[৪৮] নিত্যমভোজ্যম্। গৌ. ধ. সূ. ২/৮/৮

[৪৯] পর্যুষিতমশাকভক্ষস্নেহমাংসমধুনি। গৌ. ধ. সূ. ২/৮/১৬

[৫০] কেশকীডাবপন্নম। গৌ. ধ. সূ. ২/৮/৯

[৫১] কলবিঙ্কং প্লবং হংসং চক্রাঙ্গং গ্রামকুক্কুটম্।
সারসং রজ্জুবালঞ্চ দাত্যূহং শুকসারিকা।। মনু. ৫/১২

[৫২] ন ভক্ষযেদেকচরানজ্ঞাতাংশ্চ মৃগদ্বিজান।
ভক্ষ্যেষ্বপি সমুদ্দিষ্টান্ সর্বান্ পঞ্চনখাংস্তথা।। মনু. ৫/১৭

[৫৩] যাজ্ঞ. ১/২৭২

৪.২.২ শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা

আচারের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত কিছু নিয়ম আছে যেগুলি খুব তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। সেগুলি হল- দ্রব্যশুদ্ধি বা বিভিন্ন প্রকার বস্তুর শুদ্ধি। শুদ্ধি অর্থাৎ পবিত্রতা শরীর তথা মনের প্রসন্নতার জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। শুদ্ধতা বিষয়ে *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে- 'ভোক্ষ্যমাণস্তু প্রযতোঽপি দ্বিরাচামেদ্দ্বিঃ পরিমৃজেত্ সকৃদুপস্পৃশেত্'।[৫৪] অন্যদিকে শুদ্ধতা প্রসঙ্গে *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে -

'গতাভির্হৃদযং বিপ্রঃ কণ্ঠযাভিঃ ক্ষত্রিয়শ্শুচিঃ।

বৈশ্যোঽদ্ভি প্রাশিতাভিসস্যাত্ স্ত্রীশূদ্রৌ স্পৃশ্য চাঽন্তত ইতি'।।[৫৫]

ব্রাহ্মণের শুদ্ধি সম্ভব হয়, যদি কোনও ব্রাহ্মণ-ব্যক্তি বুক পর্যন্ত জল স্পর্শ করেন। ক্ষত্রিয়ের শুদ্ধি কণ্ঠ বা গলা পর্যন্ত জল স্পর্শ করলে সম্ভব হয়। আবার বৈশ্যের শুদ্ধি তালু পর্যন্ত জল স্পর্শ করা হলে কার্যকর হবে। কিন্তু স্ত্রী আর শূদ্রদের ক্ষেত্রে কেবল ঠোঁট পর্যন্ত জল স্পর্শ করা হলে, তা শুদ্ধ হবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। শরীর শুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শুদ্ধিরও নির্দেশ করতে গিয়ে *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে -

'অদ্ভিশশুদ্ধ্যন্তি গাত্রানি বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুদ্ধ্যতি।

অহিংসযা চ ভূতাত্মা মনস্সত্যেন শুদ্ধ্যতীতে'।।[৫৬]

জল দিয়ে শরীর শুদ্ধ হয়; জ্ঞান দিয়ে বুদ্ধি শুদ্ধ হয়; অহিংসা দিয়ে ভূতাত্মা শুদ্ধ হয়; আর সত্য দিয়ে মন পবিত্র হয়। *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* আরও উল্লেখ পাওয়া যায় যে-

[৫৪] আ. ধ. সূ. ১/৫/১৬/৯

[৫৫] বৌ. ধ. সূ. ১/৫/৮/১৮

[৫৬] বৌ. ধ. সূ. ১/৫/৮/২

আসন, শয্যা, যান, নৌকা, পথ ও ঘাস চণ্ডাল বা পতিত ব্যক্তি দ্বারা স্পৃষ্ট হলে সেটি বায়ু দ্বারাই শুদ্ধ হয়ে যায়।[৫৭] *বৌধায়ন ধর্মসূত্রের* মানসিক শুদ্ধির মতো একই কথার উল্লেখ আমরা *বিষ্ণু ধর্মসূত্রেও* পেয়ে থাকি।[৫৮]

মনুর মত অনুসারে শরীর কোনও রকম মালিন্যের দ্বারা দূষিত হলে, জল দিয়ে শুদ্ধ করা যায়, মন দূষিত হলে সত্যের দ্বারা শুদ্ধ করা হয়, বিদ্যা ও তপস্যার দ্বারা ভূতাত্মা শুদ্ধ হয় এবং বুদ্ধি শুদ্ধ হয় তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা।[৫৯] এছাড়াও মনুর মত অনুসারে দ্রব্য, সুবর্ণ, যজ্ঞপাত্র, বস্ত্র কিংবা মাটি শুদ্ধিরও বিধান দেওয়া হয়েছে।[৬০]

---

[৫৭] আসনং শয়নং যানং নাবঃ পথি তৃণানি চ।
চণ্ডালপতিতস্পৃষ্টং মারুতেনৈব শুধ্যতি। বৌ. ধ. সূ. ১/৬/৯/৭

[৫৮] অঙ্গির্গাত্রাণি শুধ্যত্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপেভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি।। বি. ধ. সূ. ২২/৯২

[৫৯] অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি।। মনু. ৫/১০৯

[৬০] মনু. ৫/১১১ - ১২০

পঞ্চম অধ্যায়

যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রে প্রতিফলিত ধর্ম ও সংস্কৃতি

পঞ্চম অধ্যায়

যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রে প্রতিফলিত ধর্ম ও সংস্কৃতি

৫.১- ধর্ম

'ধর্ম' শব্দটি কখনও কোনও একটি নির্দিষ্ট অর্থে স্থিত হয়নি, ভিন্ন ভিন্ন অর্থে, ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষায় 'ধর্ম' শব্দের অর্থ বিবর্তিত হয়েছে। 'ধর্ম' শব্দ ব্যাকরণ-প্রক্রিয়ায় √ধৃ-ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন। √ধৃ-ধাতুর বিভিন্ন অর্থ হয়, যেমন - ধারণ, অবলম্বন, পালন ইত্যাদি। 'ধর্ম' শব্দটির প্রকৃত অর্থ যা আমরা ধারণ করে থাকি অর্থাৎ ধর্ম হল সামাজিক ও ধর্মীয় নিয়ম বা কর্তব্য।

৫.১.১- পৌরোহিত্য-দেবতা-একেশ্বরবাদ

আচার্য যাস্ক দেবতা শব্দের নির্বচনে বলেছেন- দেবো দানাদ্ বা, দীপনাদ্ বা, দ্যোতনাদ্ বা, দ্যুস্থানো ভবতীতি বা।[১] অর্থাৎ দেবতা হলেন তিনিই যিনি কিছু দান করেন; স্বয়ং প্রকাশমান হন; অপরজনকে প্রকাশিত করেন এবং যিনি দ্যুলোক অধিষ্ঠান করেন। *বৌধায়ন ধর্মসূত্রেও* প্রায় একই দেবতা পাওয়া যায়, যা বৈদিক যুগ থেকেই প্রসিদ্ধ। তাঁদের স্বরূপও প্রায় একই, যা বৈদিক যুগে বর্ণিত আছে। বৈদিক যুগ থেকেই ধর্মীয় জীবনের অন্তর্গত দেবতাদের সর্বাধিক মহত্ত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে।

---

[১] নি. ৭/১৫

বৌধায়ন ধর্মসূত্রে যে সমস্ত দেবতাদের উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁরা হলেন- ব্রহ্মা[২], বরুণ[৩], আদিত্য[৪], সোম[৫], অগ্নি[৬], বায়ু[৭], প্রজাপতি[৮], মরুত্[৯], রুদ্র[১০], যম[১১], অপ্[১২], সূর্য[১৩], মিত্র[১৪] প্রভৃতি।

৫.১.২- যাগযজ্ঞ- আচার-অনুষ্ঠান-ব্রত-পঞ্চমহাযজ্ঞ

যাগ এবং যজ্ঞ এই দুটি শব্দের অর্থ প্রায় একই। অনেক সময় আমরা এই শব্দদুটিকে একত্রে প্রয়োগ করে সামগ্রিকভাবে বৈদিক যুগের কর্মানুষ্ঠানকে বুঝিয়ে থাকি। বৈদিক যুগে কর্মানুষ্ঠান বলতে মূলত বিভিন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠানকে বোঝাত। যজ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন যজ্ঞশব্দটির মূল অর্থ 'যাগ'। যাগ বলতে পারিভাষিক অর্থে বিশেষ কোনও দেবতা বা দেবগণের অনুগ্রহ লাভের জন্য তাঁদের উদ্দেশ্যে কোনও দ্রব্যের আহুতি প্রদানকে বোঝায়।

---

[২] বৌ. ধ. সূ. ১/২/৪/৪, ১/১০/১৮/২, ২/১০/১৭/১৫, ২/৫/৯/৩, ৪/৮/৮/১৪,

[৩] বৌ. ধ. সূ. ১/৪/৬/৯, ২/৪/৭/২, ২/৫/৮/৩-৯, ২/৫/৯/৪

[৪] বৌ. ধ. সূ. ১/৪/৬/১১, ২/৪/৭/১২

[৫] বৌ. ধ. সূ. ১/৫/৮/৪৬, ২/৫/৯/১, ১/৭/১৫/১১, ২/২/৪/৫, ৪/৮/৮/৩

[৬] বৌ. ধ. সূ. ২/২/৪/৫, ২/৫/৮/৯, ২/৫/৯/১-২, ৪/৮/৮/৩

[৭] বৌ. ধ. সূ. ২/৫/৯/২, ৪/৮/৮/৩

[৮] বৌ. ধ. সূ. ১/৫/১০/৫, ৩/১/১/৩৩, ২/৫/৯/১, ৪/৮/৮/৩

[৯] বৌ. ধ. সূ. ১/৬/১৩/৩

[১০] বৌ. ধ. সূ. ১/৭/১৫/৬, ২/৫/৯/১-২

[১১] বৌ. ধ. সূ. ২/১/১/৩১, ২/৫/৯/৪, ৪/৮/৮/৩

[১২] বৌ. ধ. সূ. ২/৪/৭/২

[১৩] বৌ. ধ. সূ. ২/৪/৭/১১, ৪/৮/৮/৩

[১৪] বৌ. ধ. সূ. ২/৪/৭/১১

ব্রত

এই সমাজ সংসারে মানুষ কর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়ে প্রাত্যহিক জীবন অতিবাহিত করে। এই কর্মসমূহের কিছু বাঞ্ছিত কিছু অবাঞ্ছিত। মানুষ জীবন-ধারণের জন্যই মূলত এই কর্ম করে থাকে। তবে এমন কিছু কর্মও থাকে যা পাপের কারণ হয় ওঠে। এই পাপকর্ম থেকে মুক্তির জন্য বা বলা যেতে পারে প্রায়শ্চিত্তের জন্য বৈদিক সাহিত্যে নানা প্রকার যজ্ঞাদি কর্মের বিধান যেমন রয়েছে তেমনি ধর্মসূত্র ও স্মৃতিগ্রন্থ গুলিতেও বিভিন্ন ব্রতের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ব্রতকর্ম করার ফলে পাপকর্ম থেকে মুক্তি কিংবা পুণ্য লাভ করা সম্ভব হয়। ব্রত শব্দের প্রচলন বহু যুগের পুরনো। ব্রত শব্দের ব্যুৎপত্তি 'বৃ' ধাতুর সঙ্গে 'অতচ্' প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হয়। তার অর্থ কিছু সংকলন বা প্রতিজ্ঞা করা।[১৫] ধর্মসূত্রে মুখ্যতঃ ব্রত শব্দটি প্রায়শ্চিত্ত কর্মরূপে বিহিত করা হয়। ধর্মসূত্রে যে ব্রতগুলির উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলি হল- কৃচ্ছ্রব্রত, চান্দ্রায়ণ ব্রত। *বৌধায়ন ধর্মসূত্র* অনুসারে এক বছর, ছয় মাস, চার মাস, তিন মাস, দুই মাস, এক মাস, চব্বিশ দিন, বারো দিন, ছয় দিন, তিন দিন, একদিন এবং রাত পর্যন্ত করা প্রায়শ্চিত্ত কর্মে এই ব্রত কর্মগুলি সেভাবেই করা হয় যতদিন না পর্যন্ত শরীরের শুদ্ধি হয়।[১৬]

---

[১৫] তৈ. সং. ৪/৩/১১/১,২,৩

অ. বে. ৭/৪১, ৭/৬৮,৩

[১৬] সংবস্তরঃ ষণ্মাসাশ্চত্বারস্ত্রয়ো দ্বাবেকশ্চতুর্বিংশত্যহো।

দ্বাদশাহঃ ষটহস্ত্রহোঽহোরাত্রমেকাহ ইতি কালাঃ।। বৌ. ধ. সূ. ৩/১০/১০/১৬

এবেমতানি যন্ত্রাণি তাবক্তার্যণি ধীমতা।

গৌতম ধর্মসূত্রেও বৌধায়নের মতোই নিয়মের কথা বলা হয়েছে।[১৭]

কৃচ্ছ্র

কৃচ্ছ্রব্রত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য করা হয়। পাপকে দূর করে বলে এই ব্রতের নাম কৃচ্ছ্র। কৃচ্ছ্রব্রতের স্বরূপ প্রসঙ্গে ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে- তিন দিন সকাল বেলা হবিষ্য ভক্ষণ এবং সন্ধ্যাবেলা উপবাস করতে হবে। পরের তিন দিন কেবল সন্ধ্যাবেলা হবিষ্য ভক্ষণ করতে হবে; পরের তিন দিন কাউকে না চেয়ে যা ভোজ্য পাবে সেটা খেয়ে থাকতে হবে; এর পরে আরও তিনদিন পূর্ণ উপবাস থাকতে হবে। এই ভাবে বারো দিনের বিধান পালনকে কৃচ্ছ্রব্রত বলা হয়েছে।[১৮] *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* প্রাজাপত্যকৃচ্ছ্র, বালকৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র, কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র, তপ্তকৃচ্ছ্র, সান্তপনকৃচ্ছ্র ইত্যাদি কৃচ্ছ্রব্রতের বর্ণনা পাওয়া যায়।[১৯]

গৌতম ধর্মসূত্রে কৃচ্ছ্রব্রত, অতিকৃচ্ছ্রব্রত, কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রব্রতের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২০]

মনুসংহিতায় প্রজাপত্যকৃচ্ছ্র, সান্তপনকৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র, তপ্তকৃচ্ছ্র ও পরাক কৃচ্ছ্রাদি ব্রতের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২১] যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতেও সান্তপনকৃচ্ছ্র,

---

কালেন যাবতোপৈতি বিগ্রহং শুদ্ধিমাত্মনঃ।। বৌ. ধ. সূ. ৪/৭/৭/৩

[১৭] গৌ. ধ. সূ. ৩/১/৭

[১৮] প্রাজাপত্যো ভবেতকৃচ্ছ্রো দিবা রাত্রাবযাচিতম্।
ক্রমশো বায়ুভক্ষশ্চ দ্বাদশাহং ত্র্যহং ত্র্যহম্। বৌ. ধ. সূ. ৪/৫/৫/৬
হবিষ্যান্প্রাতরাশান্ভুক্ত্বা তিস্রো রাত্রীর্নাশ্নীযাত্। অথাপরং ত্র্যহং নক্তং ভুঞ্জীত্। অথাপরং ত্র্যহং ন কংচনযাচেত্। অথাপরং ত্র্যহমুপবসেত্। গৌ. ধ. সূ. ৩/৮/২-৫

[১৯] বৌ. ধ. সূ. ৪/৫/৫/৬ - ১৬

[২০] গৌ. ধ. সূ. ৩/৮/২-৫, ৩/৬/১৯, ৩/৮/২০

মহাসান্তপনকৃচ্ছ্র, পূর্ণকৃচ্ছ্র, তপ্তকৃচ্ছ্র, পাদকৃচ্ছ্র, প্রাজাপত্যকৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র, পারক ও তুলাপুরুষ ইত্যাদি কৃচ্ছ্রব্রতের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২২]

চান্দ্রায়ণ ব্রত

চান্দ্রায়ণ ব্রতের উল্লেখ ধর্মসূত্রে অনেক প্রকারের কঠোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত রূপে পাওয়া যায়। এই ব্রত করলে ব্যক্তি শুদ্ধ হয়ে সমস্ত প্রকার পাপ থেকে মুক্তি পান। ধর্মসূত্রকারগণ এই ব্রতের বিধিকে নিজের নিজের মতানুসারে উল্লেখ করেছেন এবং এদের মহত্ব প্রতিপাদন করেছেন। *বৌধায়ন ধর্মসূত্রের* মতে, ব্রতকর্তা যদি শুক্লপক্ষে প্রতিদিন এক এক গ্রাস আহার বাড়ান, কৃষ্ণপক্ষে এক এক গ্রাস কম করে আর দুই পক্ষে দুই দিন উপবাস করেন তাহলে একে চান্দ্রায়ণ ব্রত বলে।[২৩] চান্দ্রায়ণ ব্রতের মুখ্যত চারটি ভাগ পাওয়া যায় *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে*। সেগুলি হল- শিশুচান্দ্রায়ণ[২৪], যতিচান্দ্রায়ণ[২৫], সামান্য চান্দ্রায়ণ ও পিপীলিকামধ্য চান্দ্রায়ণ[২৬]।

গৌতম ধর্মসূত্রের মতানুসারে পৌর্ণমাসীর দিনে পনেরো গ্রাস খেয়ে মাসের কৃষ্ণপক্ষে প্রতিদিন এক এক গ্রাস কম করে খাওয়া হয়। এর পর অমাবস্যার দিন

---

[২১] মনু. ১১/২১১ - ২১৬

[২২] যাজ্ঞ. ৩/৩১৪ - ৩২২

[২৩] এক বৃদ্ধয়া সিতে পিণ্ডে একহান্যাঽসিতে ততঃ।
পক্ষযোরুপবাসৌ দ্বৌ তদ্ধি চান্দ্রায়ণং স্মৃতম্।। বৌ. ধ. সূ. ৪/৫/৫/১৭

[২৪] বৌ. ধ. সূ. ৪/৫/৫/১৮

[২৫] বৌ. ধ. সূ. ৪/৫/৫/১৯

[২৬] বৌ. ধ. সূ. ৩/৮/৮/৩৪

উপবাস থাকতে হয়। তারপর শুক্লপক্ষে এক এক গ্রাস বাড়ানোর বিধান আছে। এইভাবে কর্ম করলে চান্দ্রায়ণ ব্রত সম্পূর্ণ হয়।[২৭]

মনুর মত অনুসারে পূর্ণিমাতে পনেরোটি গ্রাস ভোজন করে কৃষ্ণপ্রতিপদ প্রভৃতি এক একটি তিথিতে এক এক গ্রাস কমিয়ে অমাবস্যায় উপবাস এবং শুক্লপ্রতিপদ প্রভৃতি তিথিতে যথাক্রমে এক গ্রাস, দুই গ্রাস ইত্যাদি প্রকারে আবার পূর্ণিমায় পনেরো গ্রাস অন্ন ভোজন করণীয়। প্রতিদিন তিন বার স্নান করা কর্তব্য। একেই বলে চান্দ্রায়ণ ব্রত।[২৮] এছাড়াও *মনুসংহিতায়* যবমধ্যম চান্দ্রায়ণ[২৯], যতি চান্দ্রায়ণ[৩০], শিশু চান্দ্রায়ণ[৩১] ব্রতের ভেদ উল্লেখ করা হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্যের মত অনুসারে চান্দ্রায়ণ ব্রতকারী ব্যক্তি ময়ূরের ডিমের মতো পরিমাণ গ্রাস বানিয়ে শুক্ল পক্ষের তিথি বৃদ্ধির সঙ্গে এক এক গ্রাস বাড়িয়ে এবং কৃষ্ণপক্ষে তিথির অনুসারে এক এক গ্রাস কম করে ভক্ষণ করবেন। এই প্রকার তিথির অনুসারে গ্রাসের বৃদ্ধি আর হ্রাস করে এক মাস পর্যন্ত ভোজন করলে চান্দ্রায়ণ ব্রত সম্পূর্ণ হয়।[৩২] এছাড়াও

---

[২৭] পৌর্ণমাস্যাং পঞ্চদশা গ্রাসানভুক্ত্বৈকাপচয়েনাপরপক্ষমশ্নীযত্।
অমাবস্যাযামুপোষ্যৈকোপচযেন পূর্বপক্ষম। গৌ. ধ. সূ. ৩/৯/১২ - ১৩

[২৮] একৈকং হ্রাসয়েৎ পিণ্ডং কৃষ্ণে শুক্লে চ বর্দ্ধয়েৎ।
উপস্পৃশংস্ত্রিষবণমেতচ্চান্দ্রায়ণং স্মৃতম্।। মনু. ১১/২১৭

[২৯] এতমেব বিধিং কৃৎস্নমাচরেদ্ যবমধ্যমে।
শুল্কপক্ষাদিনিয়তশ্চরংশ্চান্দ্রায়ণব্রতম্।। মনু. ১১/২১৮

[৩০] অষ্টাবষ্টৌ সমশ্নীয়াৎ পিণ্ডান্মধ্যন্দিনে স্থিতে।
নিয়তাত্মা হবিষ্যাশি যতিচান্দ্রায়ণং চরন্।। মনু. ১১/২১৯

[৩১] চতুরঃ প্রাতরশ্নীয়াৎ পিণ্ডান্ বিপ্রঃ সমাহিতঃ।
চতুরোঽস্তহমিতে সূর্যে শিশুচান্দ্রায়ণং স্মৃতম্।। মনু. ১১/২২০

[৩২] তিথিবৃদ্ধ্যা চরেপ্তিণ্ডান্ শুক্লে শিখ্যণ্ডসংহিতান্।
একৈকং হ্রাসযেত্কৃষ্ণে পিণ্ডং চান্দ্রায়ণং চরত্।। যাজ্ঞ. ৩/৩২৩

যাজ্ঞবল্ক্যে স্মৃতিতে বলা হয়েছে এক মাসের মধ্যে দুশো চল্লিশ গ্রাস ভোজন করলেও চান্দ্রায়ণ ব্রত পূর্ণ হয়।[৩৩]

পঞ্চমহাযজ্ঞ

আপস্তম্ব ধর্মসূত্র অনুসারে পঞ্চমহাযজ্ঞের স্তুতি করার কারণে একে মহাযজ্ঞ বা মহাসত্র বলা হয়।[৩৪] তেমনি আবার *বৌধায়ন ধর্মসূত্র* অনুসারে আমরা পাই- 'অথেমে পঞ্চ মহাযজ্ঞাস্তান্যেব মহাসত্রানি দেবযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞো ভূতযজ্ঞো মনুষ্যযজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞ ইতি'।[৩৫] অর্থাৎ যে পাঁচটি মহাযজ্ঞের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেটিকে মহাসত্রও বলা হয়। সেগুলি হল- দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ এবং ব্রহ্মযজ্ঞ। আমরা এখানে মহাযজ্ঞগুলির উপরে সংক্ষেপে আলোকপাত করবো।

দেবযজ্ঞ

দেবযজ্ঞের বর্ণনা করতে গিয়ে *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে দেবতাদের উদ্দেশ্যে 'স্বাহা' শব্দের সঙ্গে কাষ্ঠের আহুতি দেওয়াকে দেবযজ্ঞ বলে।[৩৬] *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে প্রতিদিন দেবতাদের জন্য স্বাহার সঙ্গে হবন করবেন। দেবযজ্ঞের অনুষ্ঠানের জন্য মাত্র একটি কাষ্ঠের টুকরোও অর্পণ করা যায়।[৩৭]

---

[৩৩] যথাকথঞ্চিৎপিণ্ডানাং চত্বারিংশচ্ছতদ্বয়ম্।
মাসেনৈবোপভুঞ্জীত চান্দ্রাযণমথাপরম্।। যাজ্ঞ. ৩/৩২৪

[৩৪] তেষাং মহাযজ্ঞা মহাসত্রাণীতি চ সংস্তুতিঃ। আ.ধ.সূ. ১/৪/১২/১৪

[৩৫] বৌ. ধ. সূ. ২/৬/১১/১

[৩৬] আ.ধ.সূ. ১/৪/১৩/

[৩৭] অহরহস্স্বাহাকুর্যাদ কাষ্ঠাত্ তথৈতং দেবযজ্ঞং সমাপ্নোতি। বৌ. ধ. সূ. ২/৬/১১/২

পিতৃযজ্ঞ

পিতৃযজ্ঞের বিষয়ে *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে* উল্লেখ করা হয়েছে যে 'পিতৃভ্যঃ স্বধাকার'।[৩৮] অর্থাৎ পিতৃগণকে স্বধা সঙ্গে জলের অঞ্জলি অর্পণ করাই হল পিতৃযজ্ঞ। *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* পিতৃযজ্ঞের সম্বন্ধে বলা হয়েছে - 'অহরহস্স্বধাকুর্যাদোদ পাত্রাত্তথৈতং পিতৃযজ্ঞং সমাপ্নোতি'।[৩৯] অর্থাৎ প্রতিদিন পিতৃপুরুষের এর জন্য জলে পূর্ণ পাত্র ইত্যাদি দিয়ে পূজা অর্পণ করে পিতৃযজ্ঞ করতে হবে।

গৌতম ধর্মসূত্র অনুসারে প্রতিদিন স্নান করে পিতৃপুরুষদের জন্য জল দেওয়া এবং নিজের আর্থিক ক্ষমতা অনুসারে অন্য পদার্থ- ভোজন, ফলাদি, প্রদান করাকে পিতৃযজ্ঞ বলে মনে করেন।[৪০]

ভূতযজ্ঞ

প্রতিদিন প্রাণিগণের উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করাই হল ভূতযজ্ঞ। *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে - 'অহরহর্ভূতবলিমনুষ্যেভ্যো যথাশক্তি দানম্'।[৪১] ভূতযজ্ঞের লক্ষণে প্রায় একই কথা বলা হয়েছে *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে*। প্রতিদিন নমস্কার পূর্বক

---

[৩৮] আ.ধ.সূ. ১/৪/১৩/১

[৩৯] বৌ. ধ. সূ. ২/৬/১১/৩

[৪০] পিতৃভ্যশ্চোদকদানং যথোস্তাহমন্যত্। গৌ. ধ. সূ. ১/৫/৫

[৪১] আ.ধ.সূ. ১/৪/১২/১৫

পুষ্প প্রদান করে প্রাণিগণের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা প্রদান করাকেই ভূতযজ্ঞ বলে- ‘অহরহর্নমস্কুর্যাদা পুষ্পেভ্যস্তথৈতং ভূতযজ্ঞ সমাপ্নোতি’।[৪২]

মনুষ্যযজ্ঞ

আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে মনুষ্যযজ্ঞ বিষয়ে বলা হয়েছে যে প্রতিদিন মানুষের উদ্দেশ্যে নিজ সামর্থ্য অনুসারে ভোজনাদির বিষয় দান করাকেই মনুষ্যযজ্ঞ বলে। *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে প্রতিদিন ব্রাহ্মণের জন্য ভোজনাদি দিয়ে মনুষ্যযজ্ঞ করতে হবে। এখানে আমরা পাই- ‘অহরহর্ব্রাহ্মাণেভ্যোহন্নং দদ্যাদা মূলফলশাকেভ্যস্তথৈতং মনুষ্যযজ্ঞং সমাপ্নোতি’।[৪৩] অন্যদিকে আমরা *বিষ্ণু ধর্মসূত্রে* লক্ষ্য করি অতিথি সৎকারকেও মনুষ্যযজ্ঞ বলা হয়। ‘নৃযজ্ঞশ্চাতিথিপুজনম্’।[৪৪]

গৌতম ধর্মসূত্রের মতে ঘরে আগত অতিথিকে আসন, জল, ভোজন দ্রব্য দিয়ে সৎকার করাই হল মনুষ্য যজ্ঞ।[৪৫]

ব্রহ্মযজ্ঞ

ব্রহ্মযজ্ঞ বিবেচনা করতে গিয়ে *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র* মতে প্রতিদিন নিজ যোগ্যতা ও সময় অনুসারে বেদ আধ্যয়নই হল ব্রহ্মযজ্ঞ- ‘আদপাত্রাদ স্বাধ্যায় ইতি’।[৪৬] অর্থাৎ প্রতিদিন যোগ্যতা এবং সময় অনুসারে বেদপাঠ করাকে ব্রহ্মযজ্ঞ বলা হয়। এক্ষেত্রে বেদপাঠকেই সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বৌধায়ন ধর্মসূত্রের মতে বলা

---

[৪২] বৌ. ধ. সূ. ২/৬/১১/৪

[৪৩] বৌ. ধ. সূ. ২/৬/১১/৫

[৪৪] বি. ধ. সূ. ৫৯/২৫

[৪৫] শয্যাসনাবস্থানুব্রজ্যোপাসনানি সদৃক্ শ্রেযসোঃ সমানানি। গৌ. ধ. সূ. ১/৫/৩৪

[৪৬] আ. ধ. সূ. ১/৪/১৩/১

হয়েছে যে, মানুষের প্রত্যহ বেদের অধ্যয়নকেই ব্রহ্মযজ্ঞ বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়কেও গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে - 'স্বাধ্যায়ো বৈ ব্রহ্মযজ্ঞঃ'।[৪৭]

গৌতম ধর্মসূত্রের মত অনুসারে প্রতিদিন সময় অনুসারে বেদ পাঠ করাকে ব্রহ্মযজ্ঞ বলে।[৪৮]

৫.১.৩- পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত

কোনও কোনও পণ্ডিত ব্যক্তির মত অনুসারে, প্রায়শ্চিত্তের প্রয়ত + চিত এক অন্য ব্যুৎপত্তি। 'প্রয়ত' কথার অর্থ হল পবিত্র আর 'চিত্ত' কথার অর্থ হল সংগৃহীত। এই মতবাদ অনুসারে 'প্রায়শ্চিত্ত' কথার অর্থ হল এমন কার্য যা- জপ, তপ, দান এবং যজ্ঞ করা, যার জন্য ব্যক্তি পবিত্র হয়ে যায় আর আপনার একত্রিত করে যাওয়া পাপের নাশ করে।[৪৯] প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে কমবেশি প্রত্যেকটি ধর্মসূত্রেই আলোচনা আমরা লক্ষ্য করি। *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের* প্রথম প্রশ্নের নবম পটলে প্রায়শ্চিত্তের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। তেমনি আবার *বৌধায়ন ধর্মসূত্রের* দ্বিতীয় প্রশ্ন ও চতুর্থ প্রশ্নের কিছু অধ্যায়ে প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। *গৌতম ধর্মসূত্রের* ২৮তম অধ্যায়ের দশম অধ্যায়ে প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক আলোচনা আছে।

আচার্য বৌধায়ন শরীর তথা মনকে সমস্ত পাপকর্মের আকর বলে মনে করেন। এই শরীর এবং মনের শুদ্ধতার জন্যই *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* প্রায়শ্চিত্তের কথা

---

[৪৭] বৌ. ধ. সূ. ২/৬/১১/৭

[৪৮] নিত্যস্বাধ্যায়ঃ। গৌ. ধ. সূ. ১/৫/৪

[৪৯] ধর্মসূত্রের ইতিহাস তৃতীয় ভাগ, পৃ-১০৪৫

বলা হয়েছে।[৫০] যাঁদের মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে যে প্রায়শ্চিত্ত করলেও পাপক্ষয় সম্ভব নয়, তাঁদের এই প্রায়শ্চিত্ত না করাই শ্রেয়, যদিও প্রায়শ্চিত্ত কর্ম তৎকালীন যুগে পাপকর্ম হতে মুক্তিলাভের অন্যতম বিধান ছিল। তা আবশ্যিক সিদ্ধান্তের মধ্যেই পড়ে।[৫১] তাই প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক আলোচনা অনেক সাহিত্যেই আমরা দেখি। প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে *বৌধায়ন ধর্মসূত্রের* দ্বিতীয় প্রশ্ন ও চতুর্থ প্রশ্নের কিছু অধ্যায়ে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। যেমন 'হত্যা' বিষয়ক প্রায়শ্চিত্তকে *বৌধায়ন ধর্মসূত্রের* দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমটি হল - মানববধ সংক্রান্ত, দ্বিতীয়টি পশুবধ সংক্রান্ত। অর্থাৎ মানুষ হত্যা করা হলে যে পাপ হয়, তার প্রায়শ্চিত্ত সাধনের কথা এখানে যেমন বলা হয়েছে, তেমনি পশুবধ করা হলেও যে পাপ হয়, সে পাপ দূর করবার জন্যেও বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত সাধনের কথা বলা হয়েছে।

গৌতম ধর্মসূত্রের[৫২] মত অনুসারে এই সংস্কারে মানুষ দুষ্কর্ম করার ফলে পাপ কর্মে যুক্ত হয়। যেমন অযোগ্য ব্যক্তি যজ্ঞ করলে, অভক্ষ্য খাবার ভক্ষণ করলে, মিথ্যা কথা বললে, হিংসা করলে মানুষ পাপের অধিকারী হয়, এই জন্যই কোনও কোনও বিদ্বান ব্যক্তির মতে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন।[৫৩]

---

[৫০] বৌ.ধ.সূ ভূমিকা. পৃ- ২১

[৫১] তত্র প্রাযশ্চিত্তং কুর্যান্ন কুর্যাদিতি।

ন হি কর্ম ক্ষীযতে ইতি ।। কুর্যাত্ত্বেব।। বৌ. ধ. সূ. ৩.১০.১০.৪-৫-৬

ভ্রূণহা দ্বাদশ সমাঃ ।। বৌ. ধ. সূ. ২.১.১.২

[৫২] অথ খল্বযং পুরুষো যাপ্যেন কর্মণা লিপ্যতে যথৈতদযাজ্যযাজনমভক্ষ্যভক্ষণমবদ্যবদনং শিষ্টস্যাক্রিয়া প্রতিষিদ্ধসেবনমিতি। গৌ. ধ. সূ. ৩/১/২

[৫৩] কুর্যাদিত্যপরম্। গৌ. ধ. সূ. ৩/১/৬

মনুর মতেও পাপ কর্ম থেকে শুদ্ধ হবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন। পাপের নিষ্কৃতি না হলে নিন্দনীয়-লক্ষণযুক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয়।

'চরিতব্যমতো নিত্যং প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে।

নিন্দ্যৈর্হি লক্ষণৈর্যুক্তা জায়ন্তেঽনিষ্কৃতৈনসঃ'।।[৫৪]

স্মৃতিশাস্ত্রকার যাজ্ঞবল্ক্যের মতে অজ্ঞানতাবশত কোন পাপ কর্ম করলে তা প্রায়শ্চিত্ত কর্মের মাধ্যমে দূর হয়, কিন্তু জেনে বুঝে করা পাপ কর্ম প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা দূর হয়না, কিছুটা কম হয়, যার ফলস্বরুপ প্রায়শ্চিত্ত বচনের প্রভাবে মানুষ পাপকর্ম থেকে দূরে থাকে।[৫৫]

ব্রাহ্মণ হত্যার প্রায়শ্চিত্ত

ব্রাহ্মণকে হত্যা এই বিষয়টিকে সব থেকে বড় পাপকর্ম বলে মনে করা হয়। প্রত্যেক ধর্মসূত্রেই এই পাপকর্মের জন্য কঠিন থেকে কঠিনতর প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হয়েছে। *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে* উল্লেখ আছে যে, বর্ণের স্তর অনুসারে ব্রাহ্মণ পুরুষের হত্যাকারী নানাভাবে অভিশপ্ত অর্থাৎ ব্রহ্মঘ্ন হয়।[৫৬] *বৌধায়নের* মত অনুসারে ব্রাহ্মণহত্যা করার জন্য যদি কেউ অস্ত্র ধারণ করে তাহলে তাকে কৃচ্ছ্রব্রত পালন করতে হবে, অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলে অতিকৃচ্ছ্র ব্রত পালন করতে হবে, আর রক্ত বের হলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রতের নিয়ম পালন করতে হবে-

---

[৫৪] মনু. ১১/৫৪

[৫৫] প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যদজ্ঞানকৃতং ভবেত্।

কামতো ব্যবহার্যস্তু বচনাদিহ জায়তে।। যাজ্ঞ. ৩/২২৬

[৫৬] ব্রাহ্মণমাত্রং চ। আ. ধ. সূ. ১/৯/২৪/৭

'অপগূর্য চরেক্তৃচ্ছমতিকৃচ্ছ্রং নিপাতনে।

কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণং চেব লোহিতস্য প্রবর্তনে।।

তস্মান্নৈবাহপগুরেত ন চ কুর্বীত শোণিতমিতি।।'[৫৭]

এছাড়া যদি কোনও ব্যক্তি বিদ্বান ব্রাহ্মণের হত্যা করে তাকে বারো বছর পর্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে- এমন উল্লেখও আমরা *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* পেয়ে থাকি- 'ভ্রূণহা দ্বাদশ সমাঃ'।[৫৮] এমনকী অশ্বমেধ, গোসব কিংবা অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করবার কথাও বলা হয়েছে- 'অশ্বমেধেন গোসবেনাহগ্নিষ্টুতা বা যজেত'।[৫৯] এছাড়াও যে ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে ব্রাহ্মণ হত্যা করে থাকে, তাকে আপাত অর্থে নির্দোষ মনে হলেও সে ধর্ম অনুসারে পাপী হিসেবে গণ্য হবে। তবে ঋষিরা অজ্ঞাতসারে হত্যাকারীর মুক্তির বিধান দিয়েছেন। কিন্তু জ্ঞাতসারে হত্যাকারীর পাপ থেকে মুক্তি কোনও ভাবেই সম্ভব নয়। *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* তাই বলা হয়েছে-

'অমত্যা ব্রাহ্মণং হত্বা দৃষ্টো ভবতি ধর্মতঃ।

ঋষযো নিষ্কৃতিং তস্য বদন্ত্যমতিপূর্বকে।

মনিপূর্বং ঘ্নতস্তস্য নিষ্কৃতির্তোপলভ্যতে ।।'[৬০]

গৌতম ধর্মসূত্রকারের মত অনুসারে কেউ যদি জেনে-শুনে ব্রাহ্মণকে হত্যা করে তাহলে তাকে ভোজন ত্যাগ পূর্বক দুর্বল শরীরযুক্ত হয়ে তিন বার আগুনে লাফ দিতে হয়, তবেই তিনি সেই পাপ থেকে মুক্তি পাবেন।

---

[৫৭] বৌ. ধ. সূ. ২/১/১/৭

[৫৮] বৌ. ধ. সূ. ২/১/১/২

[৫৯] বৌ. ধ. সূ. ২/১/১/৪

[৬০] বৌ. ধ. সূ. ২/১/১/৬

মনুস্মৃতির মত অনুসারে ব্রাহ্মণকে বধ করলে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য বনে গিয়ে কুটির বানিয়ে বারো বৎসর পর্যন্ত ওই কুটীরে বসবাস করতে হবে এবং ওই ব্রাহ্মণের কপালের চিহ্ন ধারণ করে ভিক্ষা করে ভোজন করতে হবে।

'ব্রহ্মাহা দ্বাদশ সমাঃ কুটীং কৃত্বা বনে বসেত্।

ভৈক্ষ্যাণ্যাত্মবিশুদ্ধ্যর্থং কৃত্বা শবশিরোধ্বজম্'।।[৬১]

যাজ্ঞবল্ক্যের মন্তব্য থেকে আমরা যা অনুধাবন করতে পারি, তাতে বোঝা যায় তিনিও মনুর মতোই একই কথা বলেছেন।[৬২]

ক্ষত্রিয় হত্যার প্রায়শ্চিত্ত

পাশাপাশি ক্ষত্রিয় হত্যার প্রায়শ্চিত্ত ব্রাহ্মণ বধের অপেক্ষা কিছুটা কম। ক্ষত্রিয় হত্যার কারণে যে পাপ হয়, তারও প্রায়শ্চিত্ত বিধানের উল্লেখ রয়েছে নানা ধর্মসূত্রে। *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের* মত অনুসারে ক্ষত্রিয়ের হত্যা করলে যে পাপ হয়, সেই পাপ দূর করার জন্য এক হাজার গাভী দান করলে পাপের শুদ্ধি হবে বলে মনে করা হয়।[৬৩] *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* একটু ভিন্নতা আমরা লক্ষ্য করি, সেখানে বলা হয়েছে যে ক্ষত্রিয়ের হত্যা করার পর অপরাধী ব্যক্তি রাজাকে এক হাজার গাভী এবং একটি ষাঁড় পাপকর্ম দূর করার জন্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ প্রদান করবেন।[৬৪] *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* আরও

---

[৬১] মনু. ১১/৭৩

[৬২] যাজ্ঞ. ৩/২৪৩

[৬৩] ক্ষত্রিয়ং হত্বা গবাং সহস্রং বৈরযাতনার্থং দধ্যাত্। আ.ধ.সূ. ১/৯/২৪/১

[৬৪] ক্ষত্রিযবধে গোসহস্রমৃষভৈকাধিকং রাজ উস্তৃজেদ্বৈরনির্যাতনাম্। বৌ.ধ. সূ. ১/১০/১৯/১

বলা হয়েছে- 'নব সমা রাজন্যস্য।'[৬৫] অর্থাৎ যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয় হত্যা করবে তার নয় বছরের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

গৌতমের মতানুসারে, জেনেশুনে ক্ষত্রিয়ের হত্যা করলে ছয় বছর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য আর এক হাজার গাভী ও একটি ষাঁড় দান করলেই সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়- 'ঋষভৈক সহস্রাশ্চং গাং দদ্যাত্'।[৬৬]

আবার আমরা দেখি, মনুর মত অনুসারে যজ্ঞে ক্ষত্রিয়ের কোনও হত্যাকারী, ব্রহ্মহত্যার সমানই প্রায়শ্চিত্ত করবেন।[৬৭] *বৌধায়ন ধর্মসূত্রের* মতো একই বর্ণনা *যাজ্ঞবল্ক্য* স্মৃতিতেও পাওয়া যায়।[৬৮]

বৈশ্য হত্যার প্রায়শ্চিত্ত

অন্যান্য ধর্মসূত্রের মতোই বৈশ্য হত্যার নিমিত্তও কৃত পাপের প্রতিকার হিসেবে প্রায়শ্চিত্ত বিধানের উল্লেখ রয়েছে। বর্ণব্যবস্থার ক্রমানুসারে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের পরে বৈশ্যের স্থান আসে। এই জন্য বৈশ্যবধের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে অন্যদের তুলনায় অনেকটা কম প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হয়েছে। *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের* মত অনুসারে কোনও বৈশ্যকে হত্যা করলে একশ গাভী দান করতে হবে।[৬৯] এই বিষয়ে

---

[৬৫] বৌ. ধ. সূ. ২/১/১/৮

[৬৬] গৌ. ধ. সূ. ৩/৪/১৪

[৬৭] মনু. ১১/৮৭

[৬৮] যজ্ঞ. ৩/২৬৬

[৬৯] শতং বৈশ্যে। আ. ধ. সূ. ১/৯/২৪/২

বৌধায়ন ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে- 'তিস্ত্রো বৈশ্যস্য।'[৭০] অর্থাৎ বৈশ্যের হত্যায় প্রায়শ্চিত্ত সাধনে তিন বছর সময়কালের উল্লেখ করা হয়েছে এবং এছাড়াও বৈশ্যের হত্যা করলে একশ গাভী এবং একটি ষাঁড় রাজাকে দিতে হবে।[৭১]

গৌতম ধর্মসূত্রে বৈশ্যের হত্যার জন্য তিন বছর পর্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত কর্মের বিধান দেওয়া হয়েছে। আর এই প্রায়শ্চিত্তে একশো গাভী আর একটি ষাঁড় দান করতে হবে। 'বৈশ্যে তু ত্রৈবার্ষিকমৃষমৈকশতাশ্চং গাং দদ্যাত্'।[৭২]

বৈশ্য হত্যা বিষয়ে মনুস্মৃতিকারের মন্তব্য হল বৈশ্যর হত্যাকারীকে ব্রহ্মহত্যার সমান প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।[৭৩] যাজ্ঞবল্ক্যও মনুর সমান বৈশ্যবধের প্রায়শ্চিত্ত বিধানের কথা বলেছেন।[৭৪]

শূদ্রের হত্যার প্রায়শ্চিত্ত

আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের মত অনুসারে শূদ্রবধের পাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য দশটি গাভী দান করতে হবে।[৭৫] আমরা দেখব *বৌধায়ন ধর্মসূত্র* অনুসারে শূদ্র হত্যার পাপে এক বছরের প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হয়েছে। তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে,

---

[৭০] বৌ. ধ. সূ. ২.১.১.৯, পৃ- ১৫৬

[৭১] শতং বৈশ্যে দশশূদ্র ঋষভশ্চাঽত্রাধিকঃ। বৌ. ধ. সূ. ১/১০/১৯/২

[৭২] গৌ. ধ. সূ. ৩/৪/১৫

[৭৩] হত্বা গর্ভমবিজ্ঞাতমেতদেবং ব্রতং চরেত্।
রাজন্যবৈশ্যৌ চেজানাবাত্রেয়ীমেব চ স্ত্রিযাম্।। মনু. ১১/৮৭

[৭৪] বৈশ্যহাব্দং চরেদেতদ্দদ্যাদ্বৈকশতং গবাম্।
ষণ্মাসাচ্ছুদ্রহাপ্যেতদ্ধেনূর্দদ্যাদ্ দশাভবা।। যজ্ঞ. ৩/২৬৭

[৭৫] দশ শূদ্রে। আ. ধ. সূ. ১/৯/২৪/৩

এই শ্রেণিতে নারীদেরও স্থান দেওয়া হয়েছে। *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* পাই- 'সংবস্তরং শূদ্রস্য স্ত্রিয়াশ্চ'।[৭৬]

গৌতম ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে শূদ্রকে হত্যা করলে এক বছর পর্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এবং দশটি গাভী এবং একটি ষাঁড় দান করতে হবে। 'শূদ্রং সবস্তরমৃষভৈকাদশাশ্চ গাং দদ্যাত্'।[৭৭] *যাজ্ঞবল্ক্যের* মতে শূদ্রের হত্যাকারী ছয় মাস পর্যন্ত ব্রহ্মহত্যার ব্রত করবেন অথবা তাঁকে একটি ষাঁড়ের সঙ্গে দশটি গরু দান করতে হবে।[৭৮]

অর্থাৎ সমসময়ে শ্রেণিভিত্তিক বহুধাবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় শ্রেণি অনুসারে হত্যার দায়ে ভিন্ন ভিন্ন সময় কালের প্রায়শ্চিত্তের বিধান যেমন সামাজিক বর্ণভেদ তথা বর্ণবৈষম্যের প্রকট বাস্তবকে স্পষ্ট করে, তেমনি নারীদের অবস্থান শূদ্রের সমগোত্রীয় হিসেবে চিহ্নিত করায় পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যবাদের চরম রূপটিকে সামনে আনে। এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও আমাদের পারিপার্শ্বিক সমাজ ব্যবস্থায় যখন এই জাতীয় কর্কট রোগগুলি সমাজের রক্ত-মাংসে মিশে আছে তখন সমকালীন সমাজব্যবস্থায় তা যে বদ্ধমূল সামাজিক ধারণা হিসেবে গণ্য হবে- তা তো স্বাভাবিকই বটে।

বিভিন্ন সামাজিক অপরাধমূলক অন্যায়েরও বিধানকল্পে প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ রয়েছে *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে*। যেমন চুরি করার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বলা

---

[৭৬] বৌ. ধ. সূ. ২/১/১/১০

[৭৭] গৌ. ধ. সূ. ৩/৪/১৬

[৭৮] যজ্ঞ. ৩/২০৭

হয়েছে- চোর নিজে তার মস্তক মুণ্ডন করবেন এবং রাজাকে তার ক্ষত্রিয় ধর্ম সম্পর্কে সচেতন করবেন। এতে রাজা প্রহার করলে যদি তাঁর মৃত্যু ঘটে তবে সে-ই চোরের পাপমুক্তি ঘটবে। আর রাজা যদি শাস্তি প্রদান না করেন তবে সেই পাপ রাজার উপরেই বর্তাবে-

'স্কন্ধেনাঽঽদায় মুসলং স্তেনো রাজনমন্বিযাত্।

অনেন শাধি মাং রাজন্ ক্ষত্রধর্মমনুস্মরন্।।

শাসনে বা বিসর্গে বা স্তেনো মুচ্যেত কিল্বিষাত্।

অশাসনাত্তু তদ্রাজা স্তেনাদাপ্নোতি কিল্বিষমিতি'।।[৭৯]

মনুর মত অনুসারে অল্প মূল্যের দ্রব্য বা অল্প প্রয়োজনীয় দ্রব্য পরগৃহ থেকে কেউ চুরি করলে আত্মশুদ্ধির জন্য তাঁকে সান্তপন ব্রত করতে হবে এবং ওই দ্রব্যটি গৃহস্বামীকে ফেরত দিতে হবে, তবেই এই পাপ থেকে নিবৃত্তি পাওয়া যায়-

'দ্রব্যাণামল্পসারাণাং স্তেযং কৃত্বান্যবেশ্মতঃ।

চরেৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্রং তন্নির্যাত্যাত্মশুদ্ধয়ে'।।[৮০]

এছাড়াও বলা হয়েছে মণি, মুক্তা, প্রবাল, তাম্র, রজত, লৌহ, কাংস্য ও পাষাণ এই সকল জিনিসগুলির মধ্যে কিছু চুরি করলে বারো দিন তণ্ডুলকণা ভক্ষণ করতে হবে। একেই প্রায়শ্চিত্ত বিধান হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

'মণিমুক্তাপ্রবালানাং তাম্রস্র রজতস্য চ্।

অযঃ কাংস্যোপলানাঞ্চ দ্বাদশাহং কণান্নতা'।।[৮১]

---

[৭৯] বৌ. ধ. সূ. ২/১/১/১৬

[৮০] মনু. ১১/১৬৫

যাজ্ঞবল্ক্যের মতানুসারে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের সোনা চুরি করেছেন তাঁকে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। রাজনির্দেশ অনুসারে সেই ব্যক্তি রাজার হাতে দণ্ডপ্রাপ্ত হবেন। এতে তিনি মৃত্যু বরণ করতে পারেন অথবা মৃত্যু বরণ না করলেও তিনি এই দণ্ড বিধানের মধ্য দিয়েই এই পাপ থেকে মুক্তি লাভ করবেন।[৮২]

সুরাপান সম্পর্কে *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে- 'সুরাং পীত্বোষ্ণয়া কায়ং দহেত্'।[৮৩] অর্থাৎ যে মানুষ জেনে বুঝে সুরা পান করবেন একমাত্র মৃত্যুতেই তাঁর প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব। আর যে ব্যক্তি না জেনে সুরাপান করবেন তাঁর তিন মাস পর্যন্ত কৃচ্ছ্রব্রত পালন করা আবশ্যক। পাশাপাশি দ্বিতীয়বার উপনয়ন সংস্কারেরও উল্লেখ রয়েছে। 'অমত্যা পানে কৃচ্ছ্রাব্দপাদং চরেৎপুনরূপনয়নং চ'।[৮৪] এর সঙ্গে কেউ যদি বারুণী নামক সুরাপান করেন অথবা মল ও মূত্র গ্রহণ করেন তাঁদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আর বৈশ্য অনুসারে পুনঃ সংস্কারের বিধান রয়েছে-

'অমত্যা বারুণীং পীত্বা প্রাশ্য মূত্রপুরীষয়োঃ।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ পুনস্সংস্কারমর্হতি'।।[৮৫]

এছাড়া সুরাপাত্রে রাখা জল যদি কেউ গ্রহণ করেন সেই ক্ষেত্রে উথলে পড়া দুধে শঙ্খপুষ্পী জ্বালিয়ে ছয় দিন পর্যন্ত পান করা আবশ্যক-

---

[৮১] মনু. ১১/১৬৮

[৮২] ব্রহ্মাণস্বর্ণহারী তু রাজ্ঞে মুষলমর্পয়েত্।
স্বকর্ম খ্যাপযংস্তেন হতো মুক্তোহপি বা শুচিঃ।। যজ্ঞ. ৩/২৫৩

[৮৩] বৌ. ধ. সূ. ২/১/১/১৭

[৮৪] বৌ. ধ. সূ. ২/১/১/১৮

[৮৫] বৌ. ধ. সূ. ২/১/১/২০

'সুরাধানে তু য়ো ভাণ্ডে অপঃ পর্য্যুষিতাঃ পিবেত্।

শঙ্খপুষ্পীবিপক্কেন ষডহং ক্ষীরেণ বর্তযেত্'।।[৮৬]

গৌতম ধর্মসূত্রে উল্লেখ আছে সুরাপানকারী ব্রাহ্মণের মুখে গরম করা সুরা ঢালতে হবে, এর ফলে তাঁর মৃত্যু হলে ব্রাহ্মণ সুরাপানের পাপ থেকে মুক্তি পাবে।[৮৭] আরও বলা হয়েছে যে যদি কেউ অজ্ঞানতাবশত সুরাপান করে ফেলেন তাহলে তাঁকে তিন দিন পর্যন্ত ক্রমশ উষ্ণ দুধ, ঘি আর জল খেয়ে থাকতে হবে এবং উষ্ণ বায়ু সেবন করলে ওই পাপ থেকে তিনি মুক্তিলাভ করবেন।[৮৮]

মনুর মতে সুরাপান করলে তার প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক বিবেচনে বলা হয়েছে যে- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জ্ঞানপূর্বক সুরা পান করলে, প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাঁকে অগ্নিবর্ণের জ্বলন্ত সুরা পান করতে হবে - ওই সুরার দ্বারা শরীর একেবারে দগ্ধ হওয়ার পরেই ওই পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

'সুরাং পীত্বা দ্বিজো মোহাদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেত্।

তথা সঃ কাবে নিদগ্ধে মুচ্যতে কিল্বিষাত্ততঃ'।।[৮৯]

---

[৮৬] বৌ. ধ. সূ. ২/১/১/২১

[৮৭] সুরাপস্য ব্রাহ্মণস্যোষ্ণামাসিঞ্চেয়ুঃ সুরামাস্যে মৃতঃ শুধ্যেত্। গৌ. ধ. সূ. ৩/৫/১

[৮৮] অমত্যাপানে পযো ঘৃতমুদকং বায়ুং প্রতিত্র্যহং তপ্তানি স। গৌ. ধ. সূ. ৩/৫/২

[৮৯] মনু. ১১/৯১

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে বলা হয়েছে সুরাপানকারী ব্যক্তিকে সুরা, জল, ঘৃত, গোমূত্র ও দুধ- এগুলির মধ্যে কোনও একটি গরম করে প্রচুর পরিমাণে খাওয়াতে হবে এবং তার ফলে যদি তাঁর মৃত্যু ঘটে, তবেই তিনি ওই পাপ থেকে মুক্তি পাবেন।[৯০]

বৌধায়ন ধর্মসূত্র অনুসারে কোনও ব্রাহ্মণ যদি অজ্ঞাতসারে চণ্ডাল স্ত্রীকে ভোগ করেন, কোনও চণ্ডালপ্রদত্ত আহার ভোজন করেন কিংবা কোনও বস্তু গ্রহণ করেন তবে ওই ব্রাহ্মণ ব্যক্তিকে পতিত বা অছ্যুত হিসাবে গণ্য করা হবে। আর যদি উল্লিখিত কর্মগুলি জ্ঞাতসারে বা জেনেবুঝে হয় তবে উক্ত ব্রাহ্মণকে চণ্ডালের সমজাতীয় স্তর হিসেবে চিহ্নিত করা হবে-

'চণ্ডালী ব্রাহ্মণো গত্বা ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ।

অজ্ঞানাত্ পতিতো বিপ্রো জ্ঞানাত্তু সমতাং ব্রজেত্'।।[৯১]

মনুর মত অনুসারে ব্রাহ্মণ যদি অজ্ঞানতাবশতঃ চণ্ডাল কিংবা অন্ত্যজাতীয় নারীতে গমন করেন অথবা তাঁদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি পতিত হন; এবং জ্ঞানপূর্বক ওই সব ধারণ করলে ওই জাতির সমান হয়ে যান।[৯২]

ব্যভিচার সম্বন্ধীয় প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে- ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য বর্ণের পুরুষ যদি কোনও ব্রাহ্মণীর প্রতি ব্যভিচার করে তবে তাকে

---

[৯০] সুরাম্বুঘৃতগৌমূত্রপযসামগ্নিসংনিভম্।
সূরাপোঽন্যতমং পীত্বা মরণাচ্ছুদ্ধিমৃচ্ছতি।। যজ্ঞ. ৩/২৫৩

[৯১] বৌ. ধ. সূ. ২/২/৪/১৪

[৯২] চণ্ডালান্ত্যস্ত্রিয়ো গত্বা ভূক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ।
পতত্যজ্ঞানতো বিপ্র জ্ঞানাৎ সাম্যং তু গচ্ছতি।। মনু. ১১/১৭৬

আগুনে পোড়াতে হবে। যথা- ‘অব্রাহ্মণস্য শরীরো দণ্ডস্সংগ্রহণে ভবেত্।’[৯৩] এর পাশাপাশি অপর একটি কথন বর্ণিত আছে যে, কোনও শূদ্র ব্যক্তি যদি দ্বিজাতি স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচার করে তবে তার জন্যেও শাস্তি হিসেবে আগুনে পুড়িয়ে মৃত্যুর বিধান দেওয়া হয়েছে-- ‘অব্রাহ্মণস্য শরীরো দণ্ডঃ’।[৯৪] আমরা জানি যে কোনও ধরণের ব্যভিচার সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর, বিশেষ করে নারীজাতির প্রতি ব্যভিচার করা হলে তা সমাজের কালো দিকটিকেই সামনে নিয়ে আসে। কিন্তু এই ব্যভিচারী কর্মের প্রায়শ্চিত্ত বিধানে জাত-পাত-বর্ণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শাস্তির যে উল্লেখ রয়েছে. তা আবশ্যিক ভাবেই পক্ষপাত দুষ্ট হয়ে ওঠে এবং জাত-পাত ভিত্তিক সামাজিক কাঠামোর কঙ্কালটিকেই সামনে স্পষ্ট করে তোলে।

গৌতম ধর্মসূত্রকারের মত অনুসারে ব্যভিচার বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে গুরুপত্নী গমনকারীকে জ্বলন্ত লোহার উপর শুতে হবে।[৯৫]

যদি কোনও স্ত্রীলোক বিপ্রদুষ্টা অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্বক ব্যভিচারিণী হয় তাহলে তাঁকে তাঁর স্বামী পত্নীর কাজ থেকে নিবৃত্ত করে একটি ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখবেন এবং পুরুষের পক্ষে পরস্ত্রীগমনের যেরকম প্রয়শ্চিত্ত আছে, ওই পত্নীকে দিয়ে তা করাবেন।[৯৬]

---

[৯৩] বৌ. ধ. সূ. ২/২/৪/১

[৯৪] বৌ. ধ. সূ. ২/২/৩/৩

[৯৫] তপ্তে লোহশয়নে গুরুতল্পগঃ শযীত্। গৌ. ধ. সূ. ৩/৪/৮

[৯৬] বিপ্রদুষ্টাং স্ত্রিয়ং ভর্তা নিরুন্ধ্যাদেকবেশ্মনি।
যৎ পুংসঋঃ পরদারেষু তচ্চৈনাং চারয়েদ্ ব্রতম্।। মনু. ১১/১৭৭

উপপাতকের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দু-বছর সময় পর্যন্ত পতিত জীবন যাপনের কথা *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে। 'তেষাং তু নির্বেশঃ পতিতবৃত্তির্দ্বৌ সংবতসরৌ'।[৯৭] যে সকল নারীর সম্ভোগ নিষিদ্ধ যেমন- মাতৃসখী, পিতৃসখী কিংবা পতিতা নারী- তাদের সম্ভোগ করা হলে তা সমজাতীয় অন্যায় হিসাবে গৃহীত হবে। জীবিকার জন্য চিকিৎসা করা, গোসম্পদ পালন করা, নাচ, গান, অভিনয়ের শিক্ষা প্রদান করা প্রভৃতি দুষ্কর্মের জন্য সমবিধানের উল্লেখ রয়েছে। 'আগম্যাগমনং গুর্বীসখীং গুরুসখীমপপাত্রাং পতিতাং চ গত্বা ভেষজকরণং গ্রামযাজনং রঙ্গোপজীবনং নাটযাচার্যতা গোমহিষীরক্ষণং যচ্চাঽন্যদপ্যেবংযুক্তং কন্যাদূষণমিতি'।[৯৮]

*বৌধায়ন ধর্মসূত্র*কার প্রমাদের প্রায়শ্চিত্তের জন্য বলেছেন-

'প্রাযশ্চিত্তানি বক্ষ্যামোঽবিখ্যাতানি বিশেষতঃ।

সমাহিতানাং যুক্তানাং প্রমাদেষু কথং ভবেত্'।।[৯৯]

মানুষ কর্তব্যে তৎপর থাকলেও যদি অলসতা গ্রাস করে তবে জলে দাঁড়িয়ে 'ঋতং চ সত্যং চ'[১০০] এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করলে প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব। আবার জলে দাঁড়িয়ে

---

[৯৭] বৌ. ধ. সূ. ২/১/২/৬

[৯৮] বৌ. ধ. সূ. ২/১/২/৫

[৯৯] বৌ.ধ. সূ. ৪/৪/৪/১

[১০০] ঋতং চ সত্যং চে ত্যেতদধমর্ষণং ত্রিরন্তর্জলে পঠন্ সর্বস্মাত্পাপাত্প্রমুচ্যতে।। বৌ. ধ. সূ. ৪/৪/৪/২

'অয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমী'[১০১] এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করলে সব পাপ থেকেই মুক্তিলাভ সম্ভব।

এই সমস্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে বিভিন্ন দোষের জন্য আলাদা আলাদা প্রায়শ্চিত্তের নিয়ম *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে বৌধায়ন অন্য প্রায়শ্চিত্তেরও কথা বলেছেন।[১০২] ভ্রুণহত্যা করা হলে কার্যত তা বিদ্বান হত্যারই নামান্তর হয়ে ওঠে। সে ক্ষেত্রে বারো বছর পর্যন্ত প্রায়শ্চিত্তের বিধান উল্লেখ রয়েছে- 'ভ্রূণহা দ্বাদশ সমাঃ'।[১০৩]

পাপকর্ম থেকে উৎপন্ন দোষ সম্পর্কে বৌধায়নের বিবেচনা বর্ণ এবং আশ্রম অনুসারে করা হয়েছে। কিন্তু এই সংস্কার অনুসারে মানুষ তার অপকর্মের দ্বারা পাপে লিপ্ত হয়ে যায়।[১০৪] যদি কেউ মিথ্যা আচরণ করে সে অনুরূপ পাপে লিপ্ত হয় এবং যে ব্যক্তি কর্তৃক যজ্ঞ করা নিষিদ্ধ তার দ্বারা যজ্ঞকর্ম করা হলে, যাঁর কাছে দান গ্রহণ করা উচিত নয়, তাঁর কাছে দান গ্রহণ করলে এবং যাঁর কাছে কাছে অন্ন গ্রহণ করা উচিত নয়, তাঁর অন্ন গ্রহণ করলে অনুরূপ পাপ হয়।[১০৫]

অতএব *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* বিভিন্ন দোষের সাপেক্ষে সাযুজ্যপূর্ণ অবস্থানের নিরিখে প্রায়শ্চিত্ত বিধানকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরা বলতে পারি, মূলত

---

[১০১] আযং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমী দিত্যেতামৃচং ত্রিরত্নজেলে পঠন্ সর্বস্মাত্পাপাত্প্রমুচ্যতে।।বৌ. ধ. সূ. ৪/৪/৪/৩

[১০২] অথাঽতঃ প্রাযশ্চিত্তানি।।বৌ.ধ. সূ. ২/১/১/১

[১০৩] বৌ.ধ. সূ. ২/১/১/২

[১০৪] অথ খল্বয়ং পুরুষো যাপ্যেন কর্মণা। বৌ.ধ. সূ. ৩/১০/১০/২

[১০৫] মিথ্যা বা চরত্যযাজ্যং বা যাজযত্যপ্রতিগ্রাহ্যস্য বা প্রতিগৃহ্ণাত্যনাশ্যান্নস্য বাঽন্নমশ্নাত্যচরণীযেন বা চরতি। বৌ.ধ. সূ. ৩/১০/১০/৩

ভারসাম্য রক্ষা করবার তাগিদ থেকেই এই বিভিন্ন দোষের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে ছোট ও বড়ো পাপ অনুসারে স্বতন্ত্র বিবেচনার ক্ষেত্রটিকে নির্মাণ করা হয়েছে। যেখানে লঘু পাপে লঘু দণ্ড এবং গুরু পাপে গুরু দণ্ড দেবার বিধান রয়েছে।[১০৬] *বৌধায়ন ধর্মসূত্রকার* তাই যথার্থ বলেছেন-

> 'বিধিনা শাস্ত্রদৃষ্টেন প্রাযশ্চিত্তানি নির্দেশেত্ ।
>
> প্রতিগ্রহীষ্যমাণস্তু প্রতিগৃহ্য তথৈব চ'।।[১০৭]

৫.১.৪- বিবাহ

ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিবাহ সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রবিহিত বহু সংস্কার প্রাসঙ্গিকতা হারালেও বিবাহ সংস্কারটির গুরুত্ব আজও অপরিবর্তিত। আর সেই কারণেই কম-বেশি সব ধর্মসূত্রেই এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। এই সংস্কারের মধ্য দিয়ে গার্হস্থ্য জীবনের শুরু- এ জাতীয় ধারণা সমাজের সর্বস্তরের স্বীকৃত। প্রত্যেক ধর্মসূত্রে আট প্রকার বিবাহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি হল- ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, আর্ষ, দৈব, গান্ধর্ব, আসুর, রাক্ষস এবং পৈশাচ।[১০৮]

---

[১০৬] প্রাযশ্চিত্তানি বক্ষ্যমো নানার্থানি পৃথকপৃথক্।

তেষু তেষু চ দোষেষু গরীযাংসি লঘূনি চ ।। বৌ.ধ. সূ. ৪/২/২/১

[১০৭] বৌ. ধ. সূ. ২/১/১/২

[১০৮] বৌ. ধ. সূ. ১/১১/২০/১-৯

ব্রাহ্মৌ দৈব আর্ষঃ প্রাজাপত্যো গান্ধর্ব আসুরো রাক্ষসঃ পৈশাচশ্চেতি। বি. ধ. সূ. ২৪/১৮

গৌ. ধ. সূ. ১/৪/৪-১১

আচার্য মনুও ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ (সর্বপেক্ষা নিকৃষ্ট নিন্দিত) এই আট প্রকার বিবাহের কথা বলেছেন।

'ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।

গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ'।।[১০৯]

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতেও আমরা এই আট প্রকার বিবাহের কথা উল্লেখ পাই।[১১০]

ব্রাহ্ম বিবাহ:

বিবাহের ভাগের মধ্যে সব থেকে উপরের স্তর হিসেবে ব্রাহ্ম বিবাহকে বলে মনে করা হয়। *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র* অনুসারে, ব্রাহ্ম বিবাহে বরের বংশ, আচরণ, ধর্মের প্রতি বিশ্বাস, বিদ্যা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে খোঁজখবর নিতে হবে। নিজের সামর্থ্য ও ক্ষমতা অনুসারে অলংকৃত করে কন্যা প্রদান করতে হবে, তবেই এই বিবাহকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলে।[১১১] *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* ব্রাহ্ম বিবাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, যে মানব শ্রুতিজ্ঞানের সম্পন্নতা লাভ করেছে, যিনি ব্রহ্মচর্য ব্রতের পালন করে বিবাহার্থ কন্যাকে প্রার্থনা করেছেন, সেরকম ব্যক্তিকেই কন্যা প্রদান করা হলে, তখন সেই বিবাহকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলা হয়।[১১২] *বিষ্ণু ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে- আমন্ত্রিত করে গুণবান ব্যক্তির হাতে কন্যা তুলে দেওয়াকে বলা হয় ব্রাহ্ম বিবাহ।[১১৩]

---

[১০৯] মনু. ৩/২১

[১১০] যাজ্ঞ. স্মৃ. ১/৫৮-৬১

[১১১] ব্রাহ্মে বিবাহে বন্ধুশীললক্ষণসম্পন্নশ্রুতারোগ্যাণি বুধ্বা প্রজাং সহত্বকর্মভ্যঃ প্রতিপাদযেচ্ছক্তিবিষয়েণাঽলংকৃত্য। আ. ধ. সূ ২/৫/১১/১৭

[১১২] শ্রুতিশীলে বিজ্ঞায ব্রহ্মাচারিণেঽর্থিনে কন্যা দীয়তে স ব্রাহ্মঃ। বৌ. ধ. সূ. ১/১১/২০/২

[১১৩] আহুয গুণবতে কন্যাদানং ব্রাহ্মঃ। বি. ধ. সূ. ২৪/১৯

গৌতম ধর্মসূত্রকারের মত অনুসারে অন্য সব প্রকার বিবাহ থেকে ব্রাহ্ম বিবাহের একটি পৃথক স্থান আছে। বেদপাঠে বিদ্বান, উত্তম-আচরণকারী বরকে বস্ত্রের দ্বারা সুসজ্জিত করে আভূষণ দ্বারা অলংকৃত কন্যা প্রদান করাকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলা হয়।[১১৪]

শাস্ত্রজ্ঞান ও সদাচার সম্পন্ন পাত্রকে স্বয়ং আহ্বান করে নিজের কাছে আনিয়ে বর ও কন্যাকে বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করে এবং অলঙ্কারাদির দ্বারা অর্চনা করে ওই বরের হাতে কন্যাকে যে সম্প্রদান করা হয়, তাকে ব্রাহ্মবিবাহ বলা হয় বলে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে।

'আচ্ছাদ্য চার্চয়িত্বা চ শ্রুতিশীলবতে স্বয়ম্।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্মঃ প্রকীর্তিতঃ'।।[১১৫]

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতেও মনুর মতোই ব্রাহ্ম বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[১১৬]

প্রাজাপত্য বিবাহ:

বিবাহের প্রকারভেদে প্রাজাপত্য বিবাহ দ্বিতীয় প্রকার। বৌধায়ন ধর্মসূত্র অনুসারে যখন পিতা যখন কন্যাকে বস্ত্র ও অলংকারে সুসজ্জিত করে পাত্রের হাতে সমর্পণ করে বলেন, "এটি তোমার স্ত্রী, এর সঙ্গে ধর্মের আচরণ করবে" তখন এই কন্যা প্রদান করাকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলে।[১১৭]

---

[১১৪] ব্রাহ্মো বিদ্যাচারিত্রবন্ধশীলসম্পন্নাযদদ্যাদাচ্ছালংকৃতম্। গৌ. ধ. সূ. ১/৪/৪

[১১৫] মনু. ৩/২৭

[১১৬] ব্রহ্মো বিবাহ আহূয দীযতে শক্ত্যালংকৃতা।
তজ্জঃ পুনাত্যুভযতঃ পুরূষানেকবিংশতিম।। যাজ্ঞ. ১/৫৮

[১১৭] আচ্ছাদ্যালংকৃত্যৈ ষা সহধর্মং চর্যতা মিতি প্রজাপত্যঃ। বৌ. ধ. সূ. ১/১১/২০/৩

মনুসংহিতায় প্রাজাপত্য বিবাহ সম্পর্ক বলা হয়েছে -

'সহোভৌ চরতাং ধর্মমিতি বাচানুভাষ্য চ।

কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ'।।[১১৮]

অর্থাৎ তোমরা দুইজনে মিলে একসঙ্গে গার্হস্থ্যধর্মের অনুষ্ঠান করো, বরের সঙ্গে এইরকম চুক্তি করে এবং তাঁর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতিরূপে স্বীকৃতি আদায় করে অলংঙ্কারাদির দ্বারা বরকে অর্চনাপূর্বক কন্যা সম্প্রদান করাকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলা হয়। *যাজ্ঞবল্ক্য*ও মনুর মতোই প্রাজাপত্য বিবাহ বিষয়ে বিধান দিয়েছেন।[১১৯]

আর্ষ বিবাহ:

আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে আর্ষ বিবাহের বিষয়ে বলা হয়েছে- যে বিবাহে বর কন্যার পিতাকে দুটি গরু প্রদান করে বিবাহ করেন তাকে আর্ষবিবাহ বলে।[১২০]

বৌধায়ন ধর্মসূত্রকারের অনুসারে আর্ষ বিবাহে কন্যার আভিভাবককে দুটি গাভী দেওয়ার বিধান দেওয়া আছে- 'পূর্বাং লাজাহুতিং হুত্বা গোমিথুনং কন্যাবতে দত্ত্বা গ্রহণমার্ষঃ'[১২১]। *বিষ্ণু ধর্মসূত্রে* আর্ষ বিবাহ সম্বন্ধে বলা হয়েছে- বর অথবা তার বন্ধু কন্যার পিতাকে গরু প্রদান করেন।[১২২] *গৌতম ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে- 'আর্ষে

---

[১১৮] মনু. ৩/৩০

[১১৯] ইত্যুক্ত্বা চরতাং ধর্ম সহ যা দীযতেঽর্থিনে। যাজ্ঞ. ১/৬০

[১২০] আর্ষে দুহিতৃমতে মিথুনৌ গাবৌ দেয়ৌ। আ. ধ. সূ ২/৫/১১/১৮

[১২১] বৌ. ধ. সূ. ১/১১/২০/৪

[১২২] গৌমিথুনগ্রহণেনার্ষঃ। বি. ধ. সূ. ২৪/২১

গোমিথুন কন্যাবতে দদ্যাত্’। অর্থাৎ *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের* মতো একই বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে এই ধর্মসূত্রে।[১২৩]

আচার্য মনুর মত অনুসারে- বরের কাছ থেকে এক জোড়া বা দুই জোড়া গো-মিথুন (অর্থাৎ একটা গাভী ও একটা বলদ) গ্রহণ করে ওই বরকে যথাবিধি কন্যাসম্প্রদান করাকে আর্ষ বিবাহ বলা হয়-

‘একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্মতঃ।

কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্মঃ স উচ্যতে’।।[১২৪]

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতেও দুটি গরু নিয়ে কন্যাদান করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১২৫]

দৈব বিবাহ:

আপস্তম্ব ধর্মসূত্র অনুসারে যে বিবাহে পিতা কোনও শ্রৌতযজ্ঞ সম্পাদনকারী ঋত্বিককে কন্যা প্রদান করেন তাকে দৈব বিবাহ বলে।[১২৬] বৌধায়ন ধর্মসূত্রেও দৈব বিবাহ সম্পর্কে উপযুক্ত বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়।[১২৭] *বিষ্ণু ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে- যজ্ঞবেদিতে দক্ষিণার সময় ঋত্বিকের কর্মানুষ্ঠানকারী পুরুষকে অলংকৃত কন্যা প্রদান করা হয় তাকে দৈব বিবাহ বলে।[১২৮]

---

[১২৩] গৌ. ধ. সূ. ১/4/৬

[১২৪] মনু. ৩/২৯

[১২৫] আদাযার্ষস্তু গোদ্বযম্। যজ্ঞ. ১/৫৯

[১২৬] দৈবে যজ্ঞতন্ত্র ঋত্বিজে প্রতিপাদয়েত্। আ. ধ. সূ. ২/৫/১১/১৯

[১২৭] দক্ষিণাসু নীযমানাস্বন্তর্বেদি ঋত্বিজে স দৈবঃ। বৌ. ধ. সূ. ১/১১/২০/৫

[১২৮] যজ্ঞস্থঋর্ত্বিজে দৈবঃ। বি. ধ. সূ. ২৪/২০

ধর্মসূত্রকার গৌতম দৈব বিবাহ সম্পর্কে বলেছেন- যজ্ঞবেদিতে যজ্ঞ সম্পাদনকারীকে সালঙ্কারা কন্যা প্রদান করলে তাকে দৈব বিবাহ বলে।[১২৯]

মনুর মত অনুসারে, জ্যেতিষ্টোমাদি বিস্তৃত যজ্ঞ আরম্ভ হলে সেই যজ্ঞে পুরোহিতরূপে যজ্ঞকার্য নিষ্পাদনকারী ঋত্বিক্-কে যদি সালঙ্কারা কন্যা দান করা হয়, তাহলে এরূপ বিবাহকে দৈব বিবাহ বলা হয়।

'যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম কুর্বতে।

অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্মং প্রচক্ষতে'।।[১৩০]

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে বলা হয়েছে- 'যজ্ঞস্থ ঋত্বিজে দৈব'।[১৩১] অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় যথাশক্তি অলংকৃত করে ঋত্বিককে কন্যা প্রদান করা হলে তাকে দৈব বিবাহ বলে।

গান্ধর্ব বিবাহ:

আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে গান্ধর্ব বিবাহের বিষয়ে বলা হয়েছে- 'মিত্রঃ কামাস্তাংবর্তেতে স গান্ধর্বঃ'।[১৩২] কন্যা বা বর পরস্পর প্রেমপূর্বক যে বিবাহ করেন তাকে গান্ধর্ব বিবাহ বলে। গান্ধর্ব বিবাহের বিষয়ে *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে যে, প্রেমিক পুরুষের যদি প্রেমিকা কন্যার সঙ্গে যোগাযোগ থাকে এবং তাঁরা স্বেচ্ছায় বিবাহ করেন তাকে গান্ধর্ব বিবাহ বলে।[১৩৩] *বিষ্ণু ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে- 'দ্বযোঃ

---

[১২৯] অন্তর্বেদ্যৃত্বিজে দানং দৈবোঽলংকৃত্য। গৌ. ধ. সূ. ১/৪/৭

[১৩০] মনু. ৩/২৮

[১৩১] যজ্ঞ. ১/৫৯

[১৩২] আ. ধ. সূ ২/৫/১১/২০

[১৩৩] সকামেব সকামায়াং মিথম্মংযোগো গান্ধর্বঃ। বৌ. ধ. সূ. ১/১১/২০/৬

সকামযোর্মাতাপিতৃরহিতো যোগো গান্ধর্বঃ'।[১৩৪] অর্থাৎ প্রেমিকার সঙ্গে প্রেমিকের স্বেচ্ছায় বিবাহ করাকে গান্ধর্ব বিবাহ বলে।

গৌতম ধর্মসূত্রকারের মত অনুসারে গান্ধর্ব বিবাহের বিষয়ে বলা হয়েছে যে, পছন্দ করা কন্যাকে নিজের ইচ্ছায় বিবাহ করলে তাকে গান্ধর্ব বিবাহ বলে।[১৩৫] মনুসংহিতা অনুসারে, কন্যা ও বর উভয়ের ইচ্ছাবশতঃ যে পরস্পর সংযোগ তাকে গান্ধর্ব বিবাহ বলে।

'ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।

গান্ধর্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ'।।[১৩৬]

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে বলা হয়েছে পরস্পর বর-কন্যা প্রেমের দ্বারা সংযুক্ত হয়ে বিবাহ করলে সেই বিবাহকে গান্ধর্ব বিবাহ বলে।[১৩৭]

আসুর বিবাহ:

ধর্মসূত্রকার আপস্তম্বের মত অনুসারে বলা যায়- যখন বর কন্যাকে নিজের শক্তির অনুসারে ধন প্রদান করে বিবাহ করে, তখন এই প্রকার বিবাহকে আসুর বিবাহ বলা হয়।[১৩৮] *বৌধায়ন ধর্মসূত্রেও* এই একই প্রকারের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৩৯]

---

[১৩৪] বি. ধ. সূ. ২৪/২৩

[১৩৫] ইচ্ছান্ত্যাঃ স্বযং সংযোগো গান্ধর্বঃ। গৌ. ধ. সূ. ১/৪/৮

[১৩৬] মনু. ৩/৩২

[১৩৭] যজ্ঞ. ১/৬১

[১৩৮] শক্তিবিষযেণ দ্রব্যাণি দত্ত্বাঽঽবহেরন্ স আসুরঃ। আ. ধ. সূ ২/৫/১২/১

[১৩৯] ধনেনোপতোপ্যাঽঽসুরঃ। বৌ. ধ. সূ. ১/১১/২০/৭

বিষ্ণু ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে- কন্যার অভিভাবককে ধন দিয়ে কন্যাকে ক্রয় করে বিবাহ করাকে আসুর বিবাহ বলে।[১৪০]

গৌতম ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে যে, যখন কন্যার অভিভাবককে ধন দিয়ে নিজের বশে নিয়ে এসে কন্যাকে গ্রহণ করা হয়, তখন সেই প্রকার বিবাহই হল আসুর বিবাহ।[১৪১]

মনুস্মৃতিতেও ধর্মসূত্রের মতোই আসুর বিবাহে কন্যাপক্ষের পিতা প্রমুখ আত্মীয়স্বজনকে ধন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

'জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।

কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম উচ্যতে'।।[১৪২]

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে বলা হয়েছে- 'আসুরো দ্রবিণাদানাদ্'।[১৪৩] অর্থাৎ লোভ বশত অনেক ধন নিয়ে কন্যা প্রদান করাকে আসুর বিবাহ বলে।

রাক্ষস বিবাহ:

আপস্তম্ব ধর্মসূত্র অনুসারে, কন্যাপক্ষের লোককে পরাস্ত করে যদি কন্যাকে অপহরণ করে বিবাহ করা হয়, তাহলে তাকে রাক্ষস বিবাহ বলা হয়।[১৪৪] রাক্ষস বিবাহের বর্ণনা করতে গিয়ে *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে যে- বলপূর্বক কন্যাকে

---

[১৪০] ক্রয়েণাসুরঃ। ২৪/২৪

[১৪১] বিত্তেনাঽঽনতিঃ স্ত্রীমতামাসুরঃ। গৌ. ধ. সূ. ১/৪/৯

[১৪২] মনু. ৩/৩১

[১৪৩] আসুর দ্রবিণাদানাদ্। যজ্ঞ. ১/৬১

[১৪৪] দুহিতৃমতঃ প্রোথয়িত্বাঽঽবাহেরন্ স রাক্ষসঃ। আ. ধ. সূ ২/৫/১২/২

অপহরণ করাকে রাক্ষস বিবাহ বলা হয়।[১৪৫] *বৌধায়ন ধর্মসূত্রের* মতোই *গৌতম ধর্মসূত্রকারও* রাক্ষস বিবাহের বর্ণনা করেছেন।[১৪৬] বলপূর্বক কন্যাকে অপহরণ করে তার সঙ্গে বিবাহ করাকে *বিষ্ণু ধর্মসূত্রেও* রাক্ষস বিবাহ বলে।[১৪৭]

মনুর মত অনুসারে বাধাপ্রদানকারী কন্যাপক্ষীয়গণকে নিহত করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন করে এবং গৃহপ্রাচীর প্রভৃতি ভেদ করে যদি কেউ চিৎকাররত এবং ক্রন্দনরত কন্যাকে গৃহ থেকে বলপূর্বক অপহরণ করে বিবাহ করে, তবে তাকে রাক্ষস বিবাহ বলা হয়।

'হত্বা ছিত্বা চ ভিত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে'।।[১৪৮]

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে বলা হয়েছে যুদ্ধপূর্বক হরণ করে কন্যার সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন করলে, এরূপ বিবাহকে রাক্ষস বিবাহ বলে।[১৪৯]

পৈশাচ বিবাহ:

বৌধায়ন ধর্মসূত্রকারের মত অনুসারে- ঘুমন্ত, নেশাগ্রস্ত, ভয় প্রভৃতি কারণে অত্যধিক অস্থির হয়ে ওঠা কোনও কন্যাকে জোরপূর্বক বিবাহ করলে তাকেই পৈশাচ বিবাহ বলে।[১৫০] *বিষ্ণু ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে- 'সুপ্তপ্রমত্তাভিগমনাৎপৈশাচঃ'।[১৫১] অর্থাৎ

---

[১৪৫] প্রসহ্য হরণাদ্রাক্ষসঃ। বৌ. ধ. সূ. ১/১১/২০/৮

[১৪৬] প্রসহ্যাহহদানাদ্রাক্ষসঃ। গৌ. ধ. সূ. ১/৪/১০

[১৪৭] শুদ্ধহরণেন রাক্ষসঃ। বি. ধ. সূ. ২৪/২৫

[১৪৮] মনু. ৩/৩৩

[১৪৯] রাক্ষসো যুদ্ধহরণাত্। যজ্ঞ. ১/৬১

[১৫০] বৌ. ধ. সূ. ১/১১/২০/৯

ঘুমন্ত, মত্ত অথবা প্রমত্ত কন্যার সঙ্গে বলপূর্বক বিবাহ করাকে পৈশাচ বিবাহ বলে। *বৌধায়ন ধর্মসূত্রের* মতোই গৌতম ধর্মসূত্রকারও রাক্ষস বিবাহের বর্ণনা করেছেন।[১৫২]

আচার্য মনু পৈশাচ বিবাহর বিষয়ে বলেছেন যে- নিদ্রাভিভূতা, মদ্যপানের ফলে বিহ্বলা বা রোগাদির দ্বারা উন্মত্তা কন্যাকে যদি গোপনে সম্ভোগ করা হয়, তাহলে তাকে পৈশাচ বিবাহ বলে।

'সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।

স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্ঠমোঽধমঃ'।।[১৫৩]

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে বলা হয়েছে, কন্যাকে ছলপূর্বক প্রলোভিত করে বিবাহ করাকে পৈশাচ বিবাহ বলে।[১৫৪]

আপস্তম্বের বিচারে তিন প্রকারের বিবাহ (ব্রাহ্ম, আর্ষ, দৈব) উচিত বলে মনে করা হয় এবং তাদের মধ্যে প্রথমটিকে সব থেকে প্রশস্ত বলে মনে করা হয়।[১৫৫] *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* প্রথম চারটি বিবাহকে (ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, আর্ষ, দৈব) ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে প্রশস্ত বলা হয়েছে।[১৫৬] অষ্টপ্রকারের বিবাহের মধ্যে ষষ্ঠ আর সপ্তম বিবাহ ক্ষত্রিয় ধর্মের অনুকূল হয়, কারণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বলই প্রধান।[১৫৭] পঞ্চম বা অষ্টম

---

[১৫১] বি. ধ. সূ. ২৪/২৬

[১৫২] অসংবিজ্ঞাতোপসংগমাৎপৈশাচঃ। গৌ. ধ. সূ. ১/৪/১১

[১৫৩] মনু. ৩/৩৪

[১৫৪] পৈশাচঃ কন্যকাছলাত্। যজ্ঞ. ১/৬১

[১৫৫] তেষাং ত্রয অদ্যাঃ প্রশস্তাঃ পূর্বঃ পূর্বঃ শ্রেয়ান। আ. ধ. সূ ২/৫/১২/৩

[১৫৬] তেষাং চত্বারঃ পূর্বে ব্রাহ্মণস্য তেম্বপি পূর্বঃ পূর্বশ্রেয়ান্। বৌ. ধ. সূ. ১/১১/২০/১০

[১৫৭] অত্রাঽপি ষষ্ঠসপ্রমৌ ক্ষত্রধর্মানুগতৌ তত্ প্রত্যযত্বাত্ ক্ষর্ত্রস্যেতি। বৌ. ধ. সূ. ১/১১/২০/১২

এই দুটি বৈশ্য ও শূদ্রগণের ক্ষেত্রে প্রশস্ত বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[১৫৮] *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রকারের* মতে, যে প্রকারের গুণযুক্ত স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর বিবাহ হয় এবং তাদের পরস্পর মিলনের পরে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সেও একই গুণের সঙ্গে যুক্ত হয়।[১৫৯] *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* বিবাহের গুণের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, বিবাহে যে পবিত্রতা এবং গুণের মিলনের ওপর স্পষ্টত অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়, তার একমাত্র কারণ হল এই যে সন্তানের গুণ সেই বিবাহের গুণের উপর আধারিত হয়ে থাকে।[১৬০]

৫.১.৫- শ্রাদ্ধ

'জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে, কোথা, কবে?'। জন্মের মতো মৃত্যুও এক শাশ্বত সত্য। পিতৃপুরুষের মৃত্যুর পর আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে এবং তাঁদের আশীর্বাদ কামনায় দান-ধ্যান ও অতিথিভোজন করার অনুষ্ঠানকেই শ্রাদ্ধ বলে। 'শ্রদ্ধা' শব্দের সঙ্গে 'অন্' প্রত্যয় যোগ করে 'শ্রাদ্ধ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। ধর্মসূত্রে আলোচিত উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি সংস্কারের যেমন মাহাত্ম্য আছে, তেমনই পিতৃকর্মেও শ্রাদ্ধের বিশেষ মাহাত্ম্য লক্ষ্য করা যায়।

শ্রাদ্ধকর্মের সময়

পিতৃগণকে সন্তুষ্ট করার জন্য শ্রাদ্ধকর্ম করাও নিতান্ত আবশ্যক বলে মনে করা হয়। তা অবশ্যই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হবে। শ্রাদ্ধের সঙ্গে

---

[১৫৮] পঞ্চমাষ্ঠমৌ বৈশ্যশূদ্রাণাম্। বৌ. ধ. সূ. ১/১১/২০/১৩

[১৫৯] যথাযক্তো বিবাহস্তথা যুক্তা প্রজা ভবতি। আ. ধ. সূ ২/৫/১২/৪

[১৬০] যথাযক্তো বিবাহস্তথা যুক্তা প্রজা ভবতী বজ্ঞায়তে। বৌ. ধ. সূ. ১/১১/২১/১

সম্পর্কযুক্ত কর্মের জন্য কিছু সময় নির্ধারণ করা হয়, তার উল্লেখ আমরা *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে* দেখতে পাই। *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* শ্রাদ্ধবিষয়ে সে ভাবে কোনও মত লক্ষ্য করা যায় না। শ্রাদ্ধসম্বন্ধীয় কর্ম করার জন্য প্রত্যেক মাসের বিধান দেওয়া হয়েছে। *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে- 'মাসি মাসি কার্যম্'।[১৬১] আর মাসের দ্বিতীয় পক্ষে দুপুরের পরের সময় শ্রাদ্ধকর্মের জন্য যে মোক্ষম সময়, সেটাও উল্লেখ করা হয়েছে অপরপক্ষস্যাঽপরাহ্ণঃ শ্রেয়ান্'।[১৬২] এছাড়াও বলা হয়েছে- 'তথাঽপরপক্ষস্য জঘন্যান্যহানি' অর্থাৎ শ্রাদ্ধের জন্যে দ্বিতীয় পক্ষের অন্তিম দিন বেশি ভালো বলে মনে করা হয়।[১৬৩] *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে* আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে- 'সর্বেষ্বেবাঽপরপক্ষস্যাঽহস্সু ক্রিযমাণে পিতৃন প্রীণাতি। কর্তুস্তু কালাভিনিযমাতফলবিশেষঃ'।[১৬৪] অর্থাৎ মাসের উত্তর-পক্ষে কোনও একদিন যদি শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহলে সেই শ্রাদ্ধ-কর্ম পিতার সন্তুষ্টি প্রদান করে। তাছাড়াও সময়ের নিয়মানুসারে যিনি শ্রাদ্ধ কর্ম করবেন, তিনিও সেই বিশেষ ফল লাভ করবেন।

শ্রাদ্ধকর্মে পদার্থ, পাত্র এবং কার্যকারী নয় এমনও কিছু পদার্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে* শ্রাদ্ধকর্মে ব্যবহৃত কিছু প্রয়োজনীয় বস্তুর কথা উল্লেখ করেছে, সেগুলি হল– তিল, মাষ, চাল, যব, জল, মূল এবং ফল। 'তত্র দ্রব্যাণি

---

[১৬১] আ. ধ. সূ ২/৭/১৬/৩

[১৬২] আ. ধ. সূ. ২/৭/১৬/৪

[১৬৩] আ. ধ. সূ. ২/৭/১৬/৫

[১৬৪] আ. ধ. সূ. ২/৭/১৬/৬

তিলমাষা ব্রীহিযবা আপো মূলফলানি চ’।[১৬৫] ধর্মসূত্রকারগণ উল্লেখ করেছেন যে- পালিত ও বন্য পশুর মাংস পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে প্রদান করলে তাঁরা সন্তুষ্ট হন। *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে* মাংসবিষয়ে যে ধারণার উল্লেখ করা আছে সেটি হল– গোমাংস প্রদান করলে এক বছর পর্যন্ত সন্তুষ্টি হয়। ‘সংবস্তরং গব্যেন প্রীতিঃ’।[১৬৬] মোষের মাংস প্রদান করলে এক বছরেরও বেশি সময় পর্যন্ত পিতৃপুরুষগণ সন্তুষ্ট থাকেন- ‘ভূযাংসমতো মাহিষেণ’।[১৬৭]

৫.১.৬- অশৌচবিধি

অশৌচ দুই প্রকারের- জন্ম অশৌচ এবং মৃত্যু অশৌচ। এখন আমরা এই দুটি বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

জন্ম অশৌচ-

বৌধায়ন ধর্মসূত্র অনুসারে শিশুর জন্মানোর পর মা ও বাবা দুজনকেই দশ দিনের অশৌচ বিধানের উল্লেখ আছে।[১৬৮] কোনও কোনও বিদ্বান ব্যক্তির মতে, জন্মলাভ করবার পর অশৌচ শুধুমাত্র প্রসূতা মাতার জন্যই হয়।[১৬৯] এছাড়াও অন্য বিদ্বান ব্যক্তিরা এই অশৌচ অবস্থা কেবল মাত্র পিতার জন্য বলে মনে করেন, কারণ

---

[১৬৫] আ. ধ. সূ. ২/৭/১৬/২২

[১৬৬] আ. ধ. সূ. ২/৭/১৬/২৫

[১৬৭] আ. ধ. সূ. ২/৭/১৬/২৬

[১৬৮] জননে তাবন্মাতাপিত্রোর্দশাহমাশৌচম্। বৌ. ধ. সূ. ১/৫/১১/১৭

[১৬৯] মাতুরিত্যেকে ততপরিহরণাত্। বৌ. ধ. সূ. ১/৫/১১/১৮

সন্তান উৎপত্তির ক্ষেত্রে পিতার প্রধান ভূমিকা থাকে।[১৭০] কিন্তু চূড়ান্ত মত হল এই যে, মা ও বাবা দুজনেরই পালনের জন্য এই অশৌচ। কেননা সন্তান উৎপত্তিতে তাঁরা দুজনেই সমান ভূমিকা পালন করে থাকেন।[১৭১] *বিষ্ণু ধর্মসূত্রে* গর্ভমাস যতদিন ততদিন সময় পর্যন্ত অশৌচ পালনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু জন্ম হবার পরে মৃত্যু হলে অথবা মৃত সন্তান জন্ম হলে তৎকালশুদ্ধির বিধান দেওয়া হয়েছে।[১৭২]

এই প্রসঙ্গে গৌতমের মন্তব্য হল এই যে- জন্মের অশৌচ মা আর বাবা উভয়কে পালন করতে হয়।[১৭৩]

মনুর মতে মৃত্যুজনিত অশৌচ সব সপিণ্ডের সমান হয়। কিন্তু জন্মসম্পর্কিত অশৌচ কেবল মাতা ও পিতার জন্য হয়। আর এই অশৌচ মাতার দশরাত্রি হয়ে থাকে, কিন্তু পিতা স্নান করলেই তার সেই অস্পৃশ্যতা দূর হয়।[১৭৪]

মৃত্যু অশৌচ-

আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে অশৌচের বিষয়ে অন্য ধর্মসূত্রের তুলনায় কম নিয়মের কথা বলা হয়েছে। এক বছরেরও কম আয়ুসম্পন্ন বালকের মৃত্যুতে সপিণ্ডের স্নান করার আবশ্যকতা নেই, কেবল তার মা-বাবা আর শব নিয়ে যাওয়া লোকেদের স্নান

[১৭০] পিতুরিত্যপরে শুক্লপ্রাধান্যাত্। বৌ. ধ. সূ. ১/৫/১১/১৯

[১৭১] মাতাপিতরাবেব তু সংসর্গসামান্যাত্। বৌ. ধ. সূ. ১/৫/১১/২১

[১৭২] মাসতুল্যৈরহোরাত্রৈর্গর্ভস্রাবে। জাতমৃতে মৃতজাতে বা কুলস্য সদ্যঃ শৌচম্। বি. ধ. সূ. ২২/২৫-২৬

[১৭৩] মাতাপিত্রোস্তন্মাতুর্বা। গৌ. ধ. সূ. ২/৫/১৫

[১৭৪] সর্বেষাং শাবমাশৌচং মাতাপিত্রোস্ত সূতকম্।
সূতকং মাতুরেব স্যাদুপস্পৃশ্য পিতা শুচিঃ।। মনু. ৫/৬২

করতে হয়।[১৭৫] পত্নী, আচার্য, মাতা এবং পিতার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় দিন যে সময় মৃত্যু হয়েছিল ওই সময় পর্যন্ত উপবাস করার নিয়ম পাওয়া যায়।[১৭৬] এছাড়াও এঁদের মৃত্যুতে শোকচিহ্ন ধারণ করা আবশ্যক।[১৭৭] সে ক্ষেত্রে চুল কেটে, কেবল একটি বস্ত্র ধারণ করে, দক্ষিণ দিকে মুখ করে বসে, নদীতে গিয়ে জলে অঞ্জলি প্রদান করার কথা উল্লিখিত আছে।[১৭৮] *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে* উল্লেখ আছে যে- মা, বাবা এবং আচার্যের মৃত্যুর পর বারো দিনের অশৌচ হয়। এছাড়াও নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুর পর তিন দিনের অশৌচ হয়।[১৭৯] এই নিয়ম অবশ্য ব্রহ্মচারীর জন্য।[১৮০] *বৌধায়ন ধর্মসূত্র* অনুসারে যদি সাত মাস সম্পূর্ণ হবার পূর্বে বা দাঁত বেরোনোর পূর্বে বালকের মৃত্যু হয়, তাহলে কেবল স্নান করলেই সপিণ্ডের শুদ্ধি হয়।[১৮১] যদি জন্ম আর মৃত্যু দুটি একই সঙ্গে হয় তাহলে দুটোর জন্য কেবল একবারই অশৌচ হয় এবং এই অশৌচ দশ দিনের জন্য হয়ে থাকে।[১৮২] এছাড়াও দশ দিন ও দশ রাত অশৌচকাল শেষ হবার আগেই যদি দ্বিতীয় অশৌচ এসে পড়ে, তাহলে প্রথম অশৌচকালের সময়েই দুটো অশৌচ কাল সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় অশৌচ প্রথম অশৌচের নবম দিনের

---

[১৭৫] মাতাপিতরাকে তেষু। আ. ধ. সূ. ২/৬/১৫/৩

হতরিশ্চ। আ. ধ. সূ. ২/৬/১৫/৪

[১৭৬] ভার্যাযাং পরমগুরুসংস্থায়ং চাকালভোজনম্। আ. ধ. সূ. ২/৬/১৫/৫

[১৭৭] আতুরব্যজ্জনানি কুর্বীরন্। আ. ধ. সূ. ২/৬/১৫/৬

[১৭৮] কেশানপ্রকীর্যং পাংসূনোপ্যৈকবাসসো দক্ষিণামুখাস্সকৃদুপমজ্জ্যোত্তীর্যোপবিশন্ত্যেবং ত্রিঃ। আ. ধ. সূ. ২/৬/১৫/৭

[১৭৯] মাতরিপিতর্যাচার্য ইতি দ্বাদশাহাঃ। আ. ধ. সূ. ১/৩/১০/৪

[১৮০] তথা সম্বন্ধেষু জাতষু। আ. ধ. সূ. ১/৩/১০/৩

[১৮১] আসপ্তমাসাদাদন্তজননাদ্বোদকোপস্পর্শনম্। বৌ. ধ. সূ. ১/৫/১১/৩

[১৮২] জননমরণযোস্সন্নিপাতে সমানো দশরাত্রঃ। বৌ. ধ. সূ. ১/৫/১১/১৫

মধ্যেই হতে হবে, তাহলে এই প্রকার দুটি অশৌচের জন্য প্রথম প্রকার অশৌচ কালের সময় পর্যাপ্ত হয়।[১৮৩] *বৌধায়ন ধর্মসূত্র* অনুসারে আচার্য, উপাধ্যায় এবং তাঁদের কন্যার মৃত্যুর পর ক্রমশ তিন রাত আর তিন দিনের পক্ষিণী (দুই রাত আর মধ্যবর্তী দিন, বা দুই দিন আর মধ্যবর্তী রাত্রি) এবং একদিনের অশৌচ হয়।[১৮৪] ঋত্বিকের মৃত্যুর পর তিন দিন আর তিন রাত্রির অশৌচ হয়।[১৮৫] *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* এও বলা হয়েছে যে যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে শবদেহ স্পর্শ করে তাহলে তাকে তিন দিন এবং তিন রাত্রির অশৌচ পালন করতে হবে।[১৮৬] *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* জন্ম ও মৃত্যুর সময় সপিণ্ডের জন্য দশ দিনের অশৌচের বিধান দেওয়া আছে, কিন্তু ঋত্বিক এবং দীক্ষিত হওয়া ব্রহ্মচারীর জন্য অশৌচ হয় না।[১৮৭] জন্মের ক্ষেত্রে অশৌচ শিশুর জন্মের পর মা ও বাবা দুজনের জন্যই দশ দিনের অশৌচ পালনের বিধান দেওয়া হয়েছে *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে*।[১৮৮] *বিষ্ণু ধর্মসূত্রে* চার বর্ণের জন্য মৃত্যু বিষয়ক অশৌচের কথা আমরা পাই। সেখানে বলা হয়েছে 'ব্রাহ্মণস্য সপিণ্ডানাং জননমরণযোর্দশাহমাশৌচম্'। এখানে ক্রমশ দশ, বারো, পনেরো দিন তথা এক মাস এর বিধান দেওয়া হয়েছে। *বিষ্ণু ধর্মসূত্র* অনুসারে প্রথম অশৌচের যত দিন অবশিষ্ট আছে ওই দিনগুলির মধ্যে যদি দ্বিতীয় অশৌচ এসে পড়ে তাহলে একই দিনে দুটি

---

[১৮৩] অথ যদি দশারাত্রাস্সন্নিপতেযুরাদ্যং দশরাত্রমাশৌচমা নবমাদ্ দিবসাত্। বৌ. ধ. সূ. ১/৫/১১/১৬

[১৮৪] আচার্যোপাধ্যাযতপ্তত্রেপু ত্রিরাত্রং পক্ষিণ্যেকাহম্। বৌ. ধ. সূ. ১/৫/১১/২৬

[১৮৫] ঋত্বিজাং চ। বৌ. ধ. সূ. ১/৫/১১/২৭

[১৮৬] অভিসন্ধিপূর্বং ত্রিরাত্রম্। বৌ. ধ. সূ. ১/৫/১১/৩১

[১৮৭] সপিণ্ডেষ্বাদশাহমাশৌচমিতি জননমরণযোরধিকৃত্য বদন্ত্যৃত্বিগ্দীক্ষিতব্রহ্মচারিবর্জম্। বৌ. ধ. সূ. ১/৫/১১/১

[১৮৮] জননে তাবন্মাতাপিত্রোর্দশাহমাশৌচম্। বৌ. ধ. সূ. ১/৫/১১/১৭

অশৌচের শুদ্ধি হয়ে যায়।[১৮৯] যদি মৃত্যু বা জন্ম অন্য কোথাও হয় তাহলে সেটির খবর শোনার সময় অশৌচ কাল যতদিন অবশিষ্ট আছে, ততদিনের মধ্যেই শুদ্ধ হতে হবে।[১৯০]

গৌতম ধর্মসূত্রকার এ বিষয়ে বলেছেন যে ঋত্বিক, যজ্ঞে দীক্ষিত এবং ব্রহ্মচারী ব্যতীত সপিণ্ডের জন্য মৃত্যু বিষয়ক অশৌচ দশ দিন ও রাতের হয়।[১৯১] ক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রে সপিণ্ডের মৃত্যু হলে এগারো রাত্রির অশৌচ হয়।[১৯২] এরকমই বৈশ্যদের ক্ষেত্রে বারো রাত্রির অশৌচ হয়। আবার কোনও কোনও আচার্যের মত অনুসারে বৈশ্যদের ক্ষেত্রে অর্ধেক মাসেরও অশৌচ হয়।[১৯৩] শূদ্রের জন্য এক মাসের অশৌচ হয়।[১৯৪]

মনুর মতে বিদেশে অবস্থানকারীর (অর্থাৎ গ্রামান্তরাদিতে অবস্থিত) সপিণ্ডের মৃত্যু হলে, সেই সংবাদ যদি ওই নির্দিষ্ট ব্যক্তি দশ দিনের মধ্যে শুনতে পান, তাহলে অশৌচের যে কটি দিন অবশিষ্ট থাকবে, সেই দিনগুলিই সপিণ্ডগণের অশৌচ থাকে।[১৯৫] *যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে* বর্ণক্রমানুসারে অশৌচের বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, সপিণ্ড ব্যক্তির জন্ম এবং মৃত্যুতে ক্ষত্রিয়দের জন্য বারো দিনের, বৈশ্যদের

---

[১৮৯] জননশৌচমধ্যে যদ্যপরং জননাশৌচং স্যাওদা পূর্বাশৌচব্যপগমে শুদ্ধিঃ। বি.ধ. সূ. ২২/৩৫

[১৯০] শ্রুত্বা দেশান্তরস্থো জননমরণে অশৌচশেষেণ শুধ্যেত্। বি. ধ. সূ. ২২/৩৯

[১৯১] শাবমাশৌচং দশারাত্রমনৃত্বিগ্দীক্ষিত ব্রহ্মচারিণাং সপিন্ডনাম। গৌ. ধ. সূ. ২/৫/১

[১৯২] একাদশরাত্রং ক্ষত্রিযস্য। গৌ. ধ. সূ. ২/৫/২

[১৯৩] দ্বাদশরাত্রং বৈশ্য স্যার্ধমাসমেকে। গৌ. ধ. সূ. ২/৫/৩

[১৯৪] মাসং শূদ্রস্য। গৌ. ধ. সূ. ২/৫/৪

[১৯৫] বিগতন্তু বিদেশস্থং শৃণুয়াদ্ যো হ্যনির্দশম্।
যচ্ছেষং দশরাত্রস্য তাবদেবাশুচির্ভবেৎ।। মনু. ৫/৭৫

জন্য পনেরো দিনের এবং শূদ্রদের জন্য ত্রিশ দিনের অশৌচ হয়। কিন্তু এও বর্ণিত আছে যে, ন্যায়বর্তী (দ্বিজের সেবায় নিযুক্ত) শূদ্রদের জন্য পনেরো দিনের অশৌচ হয়।[১৯৬]

৫.২- সংস্কৃতি

কোনও একটি সমাজের মানুষদের জীবিকা, আমোদ-প্রমোদ, ক্রীড়া, বিনোদন, ললিতকলা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে সমাজের যে একটি রূপ ফুটে ওঠে তাকেই সংস্কৃতি বলে। কোনও সমাজ কতটা উন্নত তা সেই সমাজের সংস্কৃতির পরিচয় প্রদান করে। ধর্মসূত্রগুলিতে বর্ণিত নানা ধরণের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বিনোদন ও ক্রীড়া বিষয়ক তথ্যগুলি তৎকালীন সমাজের রূপ ফুটিয়ে তোলে।

৫.২.১- ক্রীড়া ও আমোদ-প্রমোদ

আধুনিক যুগের মতো তখনো খেলাধুলার প্রচলন ছিল বলে মনে হয়। অশ্বচালনা, অক্ষক্রীড়া, রথচালনা ইত্যাদি খেলা হিসাবে পরিচিত। পাশাখেলার প্রাচীন নিদর্শন আমরা পাই ঋগ্বেদের অক্ষসূক্তে (১০/৩৪)। পাশার প্রতি ছিল মানুষের অমোঘ আকর্ষণ। তার নির্মম পরিণতির কথা জেনেও প্রাচীন কাল থেকেই অদ্যাবধি কিছু মানুষের এর প্রতি আকর্ষণ বিদ্যমান। পাশাখেলা কতটা সর্বনাশা ছিল তা প্রমাণিত হয়েছে অক্ষসূক্তে ও মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের সব হারানোর আখ্যানে।

বৈদিক যুগে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে কিছু বিষয়, যেমন আজিধাবন প্রক্রিয়া, অক্ষক্রীড়া ইত্যাদি। এছাড়াও নানা বাদ্য যন্ত্রের উল্লেখ

---

[১৯৬] ক্ষত্রস্য দ্বাদশাহানি বিশঃ পঞ্চদশৈব তু।
ত্রিংশদিনানি শূদ্রস্য তদর্ধং ন্যাযবর্তিনঃ।। যজ্ঞ. ৩/২২

থেকে অনুমান করা যায় এই সকল বিষয় মানুষের বিনোদনের মাধ্যম ছিল। সোমরস নিষ্কাশনের সময় পুরোহিত গানযুক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করতেন। ঋক্‌সংহিতায় কর্করী, দুন্দভি, শততন্ত্রী, বাণ, বংশী প্রভৃতি নানা রকম বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ প্রমাণ করে যে, সে যুগেও আমোদ-প্রমোদ ও বিনোদনের ব্যবস্থা ছিল।

৫.২.২- পরিধেয়-পরিচ্ছদ-অলঙ্করণ ও প্রসাধন

ঋগ্বেদের যুগে নারী ও পুরুষ অধোবাস এবং ঊর্ধ্ববাস-- এই দ্বিবিধ বস্ত্র পরিধান করতেন বলে জানা যায়।[১৯৭] পরবর্তী কালে সূত্রগ্রন্থে অধোবাস ও ঊর্ধ্ববাস স্থানে যথাক্রমে অন্তরীয় ও উত্তরীয় শব্দের প্রচলন দেখা যায়।[১৯৮] ধর্মসূত্রের সমকালীন সমাজে বহুবিধ বস্ত্রের ব্যবহার থেকে পরিধানের বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা যায়। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে কোনও ব্রাহ্মণের হরিণ বিশেষত কালো হরিণের চর্ম পরিধানের কথা উল্লিখিত আছে।[১৯৯] ক্ষত্রিয়দের রুরু মৃগের[২০০], আর বৈশ্যগণের ছাগলের চামড়ার বস্ত্র পরিধান করবার কথা বর্ণিত রয়েছে।[২০১] বৌধায়ন ধর্মসূত্রকারও আপস্তম্বের ন্যায় বর্ণানুক্রমে বস্ত্রধারণ করার বিধান স্বীকার করে

[১৯৭] ঋ. ১/১১৫/৪

[১৯৮] নরেন্দ্রনাথ ভট্রাচার্য, প্রাচীন ভারতীয় সমাজ, পৃ-৬০

[১৯৯] হারিণমৈণেযং বা কৃষ্ণং ব্রাহ্মণস্য। আ. ধ. সূ. ১/১/৩/৩

[২০০] রৌরবং রাজন্যস্য। আ. ধ. সূ. ১/১/৩/৫

[২০১] বস্তাজিনং বৈশ্যস্য। আ. ধ. সূ. ১/১/৩/৬

নিয়েছেন।[২০২] বৌধায়ন ধর্মসূত্রে ক্ষৌম বস্ত্রেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।[২০৩] এছাড়াও কৃতপ বস্ত্রের কথাও বর্ণিত হয়েছে।[২০৪]

গৌতম ধর্মসূত্রেও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্র পরিধানের কথা উল্লিখিত আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের যথাক্রমে কালো হরিণ এবং ছাগলের চামড়ায় নির্মিত পোশাককে উত্তরীয় রূপে ধারণ করবার কথা উল্লিখিত হয়েছে।[২০৫]

অন্যদিকে, মনুর মত অনুসারে কোনও ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী কার্ষ্ণ (অর্থাৎ কৃষ্ণসার মৃগের) চামড়া দিয়ে নির্মিত উত্তরীয় কিংবা শণ জাতীয় (শণনির্মিত বস্ত্রের) অধোবসন পরবেন বলে বর্ণিত আছে। ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী রৌরব (রুরু নামক মৃগের) চামড়া দিয়ে তৈরি উত্তরীয় কিংবা ক্ষৌমবসন এবং কোনও বৈশ্য ব্রহ্মচারী ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরি উত্তরীয় এবং আবিক অর্থাৎ মেষলোম দিয়ে নির্মিত অধোবসন পরবেন- একথা বর্ণিত রয়েছে।[২০৬]

ধর্মসূত্রের সমকালীন সমাজে কিছু কিছু জায়গায় আমরা অলংকারের কথারও উল্লেখ পাই। অলংকারের মধ্যে সোনা, রূপা প্রভৃতির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। দৈনন্দিন জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু অনুষ্ঠানে এই সকল অলংকারের ব্যবহারের কথা আমরা লক্ষ্য করি। যেমন আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের ব্রাহ্ম বিবাহ আলোচনায় লক্ষ্য করি যে, সেখানে বলা হয়েছে আর্থিক অবস্থা অনুসারে কন্যাকে অলংকৃত করে প্রদান করতে

---

[২০২] কৃষ্ণরুরুবস্তাজিনান্যজিনানি। বৌ. ধ. সূ. ১/২/৩/১৫

[২০৩] বৌ. ধ. সূ. ১/৫/৮/৩৬

[২০৪] বৌ. ধ. সূ. ১/৫/৮/৩৪

[২০৫] কৃষ্ণরুরুবস্তাজিনানি। গৌ. ধ. সু. ১/১/১৬

[২০৬] কার্ষ্ণ-রৌরব-বস্তানি চর্মাণি ব্রহ্মচারিণঃ।
বসীরন্নানুপূর্ব্যেণ শাণ-ক্ষৌমাবিকানি চ।। মনু. ২/৪১

হবে।[২০৭] আমরা দেখি বৌধায়ন ধর্মসূত্রে কুণ্ডলের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২০৮] এটি কানে পরবার জন্য ব্যবহৃত একটি অলংকার এবং তা স্ত্রী এবং পুরুষ- উভয়েই ব্যবহার করতেন। বেশভূষায় ব্যবহৃত হত জুতো, ছাতা, সুগন্ধি দ্রব্যের মতো সামগ্রী, যেগুলির উল্লেখ বৌধায়ন ধর্মসূত্রে পাওয়া যায়।[২০৯]

মনুসংহিতাতেও আমরা ব্রাহ্ম বিবাহ[২১০] এবং দৈব্য বিবাহের[২১১] আলোচনা প্রসঙ্গে অলংকারের ব্যবহারের প্রসঙ্গের উল্লেখ পাই। এছাড়াও মনু গৃহস্থের জন্য সোনার সুন্দর কুণ্ডল ধারণ করার কথা উল্লেখ করেছেন।[২১২] পুষ্পমালাকেও অলংকারের অন্তর্গত বলে মনে করা হয়। মালা পরার প্রচলন বহু প্রাচীন। সাদা ফুলের মালা পরার কথা আমরা যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে পাই।[২১৩]

---

২০৭ আ. ধ. সূ. ২/৫/১১/১৭

২০৮ বৌ. ধ. সূ. ২/৩/৬/৭

২০৯ বৌ. ধ. সূ. ১/৩/৫/৬, ১/২/৩/২১-৪১, ১/২/৩/২৫

২১০ মনু. ৩/২৭

২১১ মনু. ৩/২৮

২১২ মনু. ৪/৩৬

২১৩ যজ্ঞ. ১/২৯২

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

ষষ্ঠ অধ্যায়
উপসংহার
৬.১- প্রতি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার

যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রসমূহে প্রতিফলিত প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির বহুমাত্রিক অবস্থানকে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করাই বর্তমান আলোচনার মূল লক্ষ্য। প্রাথমিক পর্বে এবিষয়ক আলোচনায় সামগ্রিক নীরবতার প্রসঙ্গকে স্বীকার করে নিতে হয়। বর্তমান গবেষণা-নিবন্ধে সেই অনালোচিত দিকগুলিকেই স্পষ্ট করবার চেষ্টা করা হয়েছে। বিদ্যায়তনিক চিন্তাচর্চার আঙ্গিক থেকেও বিষয়টি হয়ে উঠেছে তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়াও সময় এবং পরিসরের নির্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম করে তা হয়ে উঠেছে অর্বাচীন।

আমরা মূলত ছয়টি অধ্যায়ে গবেষণা সন্দর্ভটিকে বিভক্ত করেছি। বহুবিধ বিষয়কে বিভিন্ন স্তরবিন্যাসে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রের অন্তর্নিহিত বিষয়গুলিকে স্পষ্ট করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকা অংশে গবেষণা-প্রক্রিয়ার মধ্যে গবেষণাপত্রের শিরোনাম, অবতরণিকা, সাহিত্য পর্যালোচনা, গবেষণাবকাশ, পূর্বানুমান, গবেষণা-পদ্ধতির উল্লেখ করে প্রকল্পটির গতিপথ এবং উপস্থাপনার দিগ্ নির্দেশ করা হয়েছে প্রথাগত গবেষণার পদ্ধতিকে মান্যতা দিয়ে। পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সুবিধে হয়েছে যে আলোচ্য গবেষণাকর্মটি একটি নতুন অভিমুখ তৈরি করবে। ধর্মসূত্রের পরম্পরা, ধর্মসূত্রের রচনাকাল, ধর্মসূত্রের পরিচয়, ধর্মসূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় বিশেষত ভারতীয় ধর্ম সম্পর্কে পূর্বার্জিত ধারণাগুলিকে পর্যবেক্ষণ করে তার সাপেক্ষে বিকল্প কোনও দৃষ্টিভঙ্গিকে নির্মাণ করাও এর উদ্দেশ্য। বৈদিক আচরণের সঙ্গে যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রের

যোগ থাকায় সে বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনার অবকাশ পাওয়া গেছে। যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রে উল্লিখিত চতুর্বর্ণে বিভক্ত সমাজের স্বতন্ত্র স্তর, ধর্মাচরণ, যাপন, রীতিনীতি, সমকালে প্রবহমান আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা কীভাবে রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তনকে চিহ্নিত করেছে তাকে অন্বেষণ করবার প্রাথমিক পরিকল্পনা প্রথম অধ্যায়ে গৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় 'বেদাঙ্গ সাহিত্যে ধর্মসূত্রের গুরুত্ব'-এ আমরা প্রথমেই বেদাঙ্গ সাহিত্য সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নির্মাণ করবার চেষ্টা করেছি। বেদের প্রত্যেকটি বিভাগ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানবার প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করেছি। ছয় বেদাঙ্গের মধ্যে প্রথমস্থানে থাকা শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা ধ্বনি-বিজ্ঞান হিসেবে পরিচিতি লাভে গুরুত্ব। *সামবেদ, শুক্লযজুর্বেদে, অথর্ববেদ*-সহ বিভিন্ন গ্রন্থসমূহে শিক্ষার অবস্থান কীরূপ ছিল, তা তুলে ধরা হয়েছে। ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, কল্পসূত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। অধিকাংশ মন্ত্রই ছন্দোবদ্ধ; কাজেই ছন্দের গুরুত্ব অপরিসীম। আবার বেদকে বোঝার জন্য ব্যাকরণজ্ঞানও আবশ্যক। সে কারণে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ব্যাকরণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অন্যদিকে বৈদিক মন্ত্রের অর্থজ্ঞানের জন্য প্রয়োজন বেদাঙ্গ নিরুক্ত। বৈদিক শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ধারণ আবশ্যক। কল্পসূত্রের চারটি বিভাগ সম্পর্কিত ধারণাও এখানে তুলে ধরা হয়েছে। শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র ও শুল্বসূত্র সম্পর্কিত ধারণা গুলিতেও আলোকপাত করা হয়েছে, এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বে আমরা ধর্মসূত্রসমূহের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। ধর্মীয় আচরণবিধি কীভাবে বৈদিক যুগের শেষ লগ্নে 'ধর্মসূত্র' হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে, নির্দিষ্ট

বিধিনিষেধগুলিই সংকলিত হয়ে নির্মাণ করেছে গ্রন্থসমূহের। আর এই গ্রন্থসমূহ থেকেই সাহিত্যের পথ চলা শুরু, পরবর্তী কালে যার সুবিস্তৃতি ঘটেছে। আমরা পেয়েছি স্মৃতিসংহিতা, আবার শ্লোকে নিবদ্ধ মনুসংহিতা কিংবা যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা। এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে আমরা গৌতম ধর্মসূত্র, আপস্তম্ব ধর্মসূত্র, বৌধায়ন ধর্মসূত্র, বিষ্ণু ধর্মসূত্র, শঙ্খলিখিত ধর্মসূত্র, বসিষ্ঠ ধর্মসূত্র, হারীত ধর্মসূত্র, মানব ধর্মসূত্র, বৈখানস ধর্মসূত্র, হিরণ্যকেশী ধর্মসূত্র এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরতে চেয়েছি। এখানে যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রের বিশেষত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। সেক্ষেত্রে আপস্তম্ব, বৌধায়ন, বিষ্ণু, শঙ্খলিখিত, বৈখানস, হারীত, হিরণ্যকেশী ধর্মসূত্রের গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। যজুর্বেদের অন্তর্গত হওয়ায় এই ধর্মসূত্রসমূহের বিন্যাসেই গড়ে উঠেছে গবেষণা নিবন্ধটির মূল ভিত্তি।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রে উল্লিখিত রাষ্ট্র এবং সমাজব্যবস্থার চিত্রকে তুলে ধরেছি। এ ক্ষেত্রে ভৌগোলিক পরিবেশ, গ্রাম ও নগর জনপদসমূহ, রাজতন্ত্র, সমাজ, বর্ণব্যবস্থা, চতুরাশ্রম, সম্পত্তিবিভাগ, নারীর সামাজিক অবস্থানের মতো প্রসঙ্গগুলিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে দেশকালগত পরিসরের অন্তবর্তী বহুবাচনিকতাকে বিকল্প এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে ঘটে যাওয়া বিবর্তনকে পুনঃপাঠের নিরিখে অবলোকন করবার প্রয়াসে উঠে এসেছে অতীত যাপনের কোলাজ। একজন গবেষক হিসেবে তাই এ যেন পিছনে ফিরে দেখবার প্রয়াস। একটি দেশের সামাজিক পরিবেশ কীভাবে তার ভৌগোলিক প্রতিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রে প্রাপ্ত ভৌগোলিক বৃত্তান্ত থেকে তাকে ধরতে চাওয়া হয়েছে। রাজার কর্তব্য ও দায়িত্ব,

আদর্শের নিরিখে, ধর্মভাবনার মিশেলে কীভাবে তা নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোকে গঠন করে ধর্মসূত্রে উল্লিখিত তথ্যসমূহের সাপেক্ষে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক কাঠামোটি বর্ণভিত্তিক। এই কাঠামোর সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত আছে কর বা শুল্ক ব্যবস্থা। বর্ণভেদে সামাজিক স্তরবিন্যাসের নিরিখে সেখানেও লক্ষ্য করা গেছে বৈষম্যমূলক রীতি। যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রের নিরিখে তা তুলে ধরা হয়েছে। দণ্ডব্যবস্থার বহুমাত্রিক চিত্র, বর্ণ ও জাতিব্যবস্থার চিত্রকেও বিশ্লেষণধর্মী পরিমার্গ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রে উল্লিখিত শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক বিবরণকে তুলে ধরা হয়েছে। বৈদিক যুগের শিক্ষাব্যবস্থা আশ্রমভিত্তিক। নির্বাচিত পাঠ্যসূচিতে আচার্য সম্পর্কিত ধারণা কিংবা সংস্কারসমূহ সম্পর্কে যেমন আলোকপাত করা হয়েছে তেমনি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় স্বাস্থ্যবিষয়ক সচেতনতা, চিকিৎসা ব্যবস্থার খুঁটিনাঁটি দিকগুলিকে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা তুলে ধরেছি ভক্ষ্য ও অভক্ষ্যের নিরিখে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ-বর্জনের বহুবিধ বিধি-নিষেধ। শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার দিকটিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আচারের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত যা কিছু নিয়ম তাৎপর্যপূর্ণ, নিয়মতান্ত্রিকতা এবং যাপন-সংস্কৃতির নিরিখে সেই বিষয়ক তথ্যগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে যর্জুবেদীয় ধর্মসূত্রে প্রতিফলিত ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গির সাপেক্ষে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত মূল্যবান তথ্যগুলিকে এখানে সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা যেতে পারে। এখানে উঠে এসেছে পৌরোহিত্য, দেবতা, একেশ্বরবাদ প্রসঙ্গ, ধর্মীয় জীবনের অন্তর্গত দেবতাদের পরিচয়। এখানে

গুরুত্বপূর্ণ প্রাত্যহিক যাপনে মিশে থাকা ধর্মের নানাবিধ রীতিনীতি, অনুষ্ঠানাদির চিত্রগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে। মূলত আধ্যাত্মিকতা এবং ব্যবহারিক লোকাচারের সংমিশ্রণই সমকালীন আচার সর্বস্ব সংস্কৃতির ভিত্তিটিকে নির্মাণ করেছে। উঠে এসেছে যাজ্ঞযজ্ঞ ব্রত কিংবা পঞ্চমহাযজ্ঞ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি। ব্রতের অন্তর্গত কৃচ্ছ্র কিংবা চান্দ্রায়ণের পরিচয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অন্যদিকে পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্তর্গত দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ বিষয়ক ধারণাকে স্পষ্ট করা হয়েছে। পাপ ও প্রায়শ্চিত্তের আপাত বিপ্রতীপ অবস্থানকে যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রের পরিমার্গ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শরীর তথা মন যদি পাপকর্মের আকর হয় তবে সেই শরীর ও মনকে শুদ্ধ করবার জন্যেই প্রায়শ্চিত্ত সাধনের উল্লেখ রয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হত্যার প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে উল্লিখিত নানাবিধ বিধানগুলি সামাজিক স্তরবিন্যাসের স্বতন্ত্র প্রতীকগুলিকে চিহ্নিত করে। আমরা তুলে ধরেছি বিবাহ-সম্পর্কিত নানাবিধ ধরনগুলিকে। সেই সূত্রে ব্রাহ্ম বিবাহ, প্রাজাপত্য বিবাহ, আর্ষ বিবাহ, দৈব বিবাহ, গান্ধর্ব বিবাহ, আসুর বিবাহ, রাক্ষস বিবাহ, পৈশাচ বিবাহ সম্পর্কিত ধারণাগুলিকে স্পষ্ট করা হয়েছে। অন্যদিকে শ্রাদ্ধবিষয়ক রীতিনীতিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রাত্যহিক ধর্মীয় যাপন সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে এক্ষেত্রে অশৌচবিধি, জন্ম ও মৃত্যুর নিরিখে তার স্বতন্ত্র নিয়মাদিকে তুলে ধরা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা অবসর যাপনের অংশ হিসেবে ক্রীড়া কিংবা আমোদ-প্রমোদের দিকটিকেও তুলে ধরেছি। সেক্ষেত্রে আকর হিসাবে ব্যবহৃত নানা উপাদানসমূহের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। উঠে এসেছে লোকায়ত ক্রীড়ার প্রসঙ্গ। এছাড়াও রয়েছে পরিধেয়, পরিচ্ছদ, অলঙ্করণ, প্রসাধনের বিস্তারিত বর্ণনা।

৬.২- নতুন দিগ্‌দর্শন

যজুর্বেদের ধর্মসূত্র বিষয়ক নানা গবেষণামূলক গ্রন্থ বিদ্যমান থাকলেও সেগুলি মূলত পৃথক পৃথক। ধর্মসূত্র বিষয়ক প্রচলিত আলোচনাগুলিতে যজুর্বেদের সকল ধর্মসূত্রগুলির তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৎকালীন সমাজ ও সাংস্কৃতিক আলোচনা উপলব্ধ হয়না বললেই চলে। তাই যজুর্বেদে উপলব্ধ সকল ধর্মসূত্রগুলির বিষয়বস্তুকে মন্থন করে বিশ্লেষণাত্মক ও তুলনাত্মক পদ্ধতিকে অবলম্বন করে যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রে প্রতিফলিত প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির যে রূপ ফুটে ওঠে, তাকে আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। তৎকালীন সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, দণ্ডব্যবস্থা, ললিতকলা, বিনোদনের মতো বহুমাত্রিক বিষয়গুলি সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনার মধ্য দিয়ে একটি সম্যক ধারণা লাভই মূল উদ্দেশ্য হলেও, মনে রাখতে হবে- বেদ হল অখিল ধর্মের মূল। তাই তার অর্থ অনুধাবন করা খুবই কঠিন বিষয়। এবিষয়ে সময়ের সীমাবদ্ধতা, জ্ঞানের স্বল্পতা নানান শারীরিক প্রতিকূলতা ধর্মসূত্রের আরও কিছু বিষয় উপস্থাপন করতে বাধা প্রদান করেছে। যেমন - যজুর্বেদের ধর্মসূত্রের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মসূত্রের বিষয় গুলির তুলনামূলক আলোচনা আরও বিশদভাবে তুলে ধরা যেতে পারত। পূর্বে উল্লিখিত বিশ্লেষণাত্মক ও তুলনাত্মক পদ্ধতি সমগ্র গবেষণা সন্দর্ভটির নির্মাণে অনুসরণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে ঠিকই, তবে মনে রাখতে হবে নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই মহৎ কাজের যথার্থ উপস্থাপন অনেক পণ্ডিতগণের কাছেও কষ্টকর। সে ক্ষেত্রে আমাদের এই প্রয়াস অত্যন্ত নগণ্য। এ কথা মাথায় রেখেও বলা যায়, ভেলায় চড়ে সাগর পাড়ি দেবার বাসনায় অন্ধকার থেকে আলোতে আসার অদম্য ইচ্ছেতেই এই কাজে

অবতীর্ণ হওয়া। এখন সবিনয়ে বিদ্বদগণের কাছে গবেষণা সন্দর্ভটির গুনমান বিচারের জন্য উপস্থাপন করছি।

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

সংস্কৃত গ্রন্থ-

অষ্টাধ্যায়ী, सम्पा. गोपालदत्तपाण्डे, चौखाम्वा पावलिसिं हाउस, वाराणसी

आपस्तम्ब-धर्मसूत्रम्, सम्पा. उमेशचन्द्रः पाण्डेय, चौखम्वा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, २०१६ (पुनर्मुद्रित)

गौतमधर्मसूत्राण. (सम्पा.) उमेशचन्द्रः पाण्डेय. चौखम्वा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी, १९९६

तैत्तिरीय-व्राह्मण. (सम्पा.) गणेश उमाकान्त थिटे. न्यू भारतीय वुक कारपोरेशन, दिल्ली, २०१२ (पुनर्मुद्रित)

पाण्डेय, शान्तिः. *धर्मसूत्र-परिशीलन,* प्राच्यभारती संस्थान, गोरखपुर, २००२

बंसल, नयनताराः. *धर्मसूत्रों का महत्त्व.* भारतीय विद्या प्रकाशन, २००३

मिश्रः, जयकृष्ण. *धर्मशास्त्रस्येतिहासः.* चौखम्वा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी, २०१४ (पुनर्मुद्रित)

याज्ञवल्क्यस्मृतिः. (सम्पा.) केशवकिशोर कश्यप. चौखम्वा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, २०२९ (पुनर्मुद्रित)

वौधायन-धर्मसूत्रम्. (सम्पा.) उमेशचन्द्रः पाण्डेय. चौखम्वा प्रकाशन, २०१७ (पुनर्मुद्रित)

বাংলা গ্রন্থ-

অধিকারী, তারকনাথ। *নিরুক্ত।* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১২

অনির্বাণ। *বেদ মীমাংসা।* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০৬

আশ্বালায়ন-শ্রৌতসূত্র, সম্পা. অমরকুমার চট্টোপাধ্যায়। দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ

ঋগ্বেদ-সংহিতা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)। সম্পা. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৫

গোপথ-ব্রাহ্মণ (পঞ্চদশখণ্ড)। সম্পা. তারকনাথ অধিকারী। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ১৪২৩

পঞ্চবিংশ-ব্রাহ্মণ (একাদশখণ্ড)। সম্পা. প্রদ্যোৎ কুমার দত্ত। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ১৪২৩

পাণিনীয়শিক্ষা⊠ সম্পা. অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়⊠ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৬

বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি। *বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা।* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৬

বসু, যোগীরাজ। *বেদের পরিচয়*। ফর্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৯

বসু, সুমিতা। *ধর্ম-অর্থ-নীতিশাস্ত্রসমীক্ষা*। বলরাম প্রকাশনী, ২০১৮

বিষ্ণুপুরাণম্⊠ সম্পা. পঞ্চানন তর্করত্ন। নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪২২

ভট্টাচার্য, অমিত। *প্রাচীন ভারতের সংস্কার চর্চা*। সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০২

ভট্টাচার্য, জনেশ রঞ্জন। *ধর্ম শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।* বি. এন. পাবলিকেশন্, ২০১৬

ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ। *ভারত ইতিহাসে বৈদিক যুগ।* কলকাতা, ১৯৯৮

ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ। *ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস।* কলকাতা, ২০১৪ (তৃতীয় মুদ্রণ)

ভট্টাচার্য্য, ভবানীপ্রসাদ এবং অধিকারী, তারকনাথ⊠ *বৈদিক সংকলন* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৪

ভট্টাচার্য, সুকুমারী। *প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সাহিত্য।* আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯৮ (প্রথম প্রকাশ)

মুখোপাধ্যায়, গুরুশঙ্কর⊠ *ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমঃ।* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০৯ (পুনর্মুদ্রণ)

মনুস্মৃতি। সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪২৭ (পুনর্মুদ্রণ)

যজুর্বেদ-সংহিতা। সম্পা. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮২

সামবেদ-সংহিতা। সম্পা. পরিতোষ ঠাকুর। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৫

সেনগুপ্ত, সঙ্ঘমিত্রা। *মহাভাষ্যম্*⊠ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪১৭ (পুনর্মুদ্রণ)

ইংরেজি গ্রন্থ-

Banerji, Sures Chandra. *Dharma-sūtras.* Punthi Pustak, Calcutta (now Kolkata), 1962

Banerji, Sures Chandra. *Dharmaśāstra*. D.K. Printworld (P) Ltd, New Delhi, 1998

Buhler, Georg. *The Sacred Books Of The East* (Vol. 2). Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, Reprint: 2007 (1879)

Chakrabarti, Samiran Chandra. *Āpastamba-Sāmānya-Sūtra or Yajñaparibhāṣā Sūtra.* The Asiatic Society, kolkata, 2006

Buhler, Georg. *The Sacred Books Of The East* (Vol. 25). Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, 12th Reprint: 2015 (1879)

Caland.W. *Vaikhānasasmārtasūtram*. The Asiatic Society, Kolkata, 2002 (Reprint)

Gopal, Ram. *India of Vedic Kalpasutras.* Delhi National Publishing House, 1959

Jolly, Julius. *The Institutes Of Vishnu.* The Clarendon Press, 1900

Kane, Pandurang Vaman. *History of Dharmaśāstra*. Oriental Research Institute, Poona, 1968

Olivelle, Patrick. *Dharmasūtras*. Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 2000

Swain, Brajakishore. *The Dharmaśāstra.* Akshaya Prakashan, Delhi, 2004